ভে ত রে

মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার রায় ২
বিহারে সামন্ত হিংসার বিরুদ্ধে "ন্যায় মার্চ" ... ৩
আদিবাসী মহিলার ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ... ৪
... সুব্রমণিয়ন কার স্বার্থ রক্ষা করবেন ৫
সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটির আবেদন ... ৬
'বীর' সাভারকর, সঙ্ঘ পরিবার ঃ কিছু তথ্য ৭

দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৩৫ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৩০ অক্টোবর ২০১৪

জন আন্দোলনের গণতান্ত্রিক মঞ্চ অভিমুখে

দিল্লীর জওহরলাল নেহরু যুবকেন্দ্রে গত ১১ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং সংগঠনের প্রতিনিধিরা এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল এমন এক বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মঞ্চের প্রয়োজনিয়তা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা যে মঞ্চ একই সঙ্গে গণ আন্দোলন ও অধিকারের ওপর প্রবল আক্রমণকে যৌথভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং এক বিকল্প ভারতের ধারণাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

এই আলোচনা থেকে উঠে আসা ও অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সমর্থিত প্রস্তাবনাটি এরকম—

দিল্লীতে গত ১১ অক্টোবর বিভিন্ন ব্যক্তি ও নানামুখী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল এক বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মঞ্চের নির্মাণ। এমন এক মঞ্চ যা জনগণের জীবন, জীবিকা, জমি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার এবং ন্যায়, শান্তি, মর্যাদা ও স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবে। বিশেষত বর্তমানের এমন একটা সময়ে যখন এইসমস্ত অধিকারগুলো সাম্প্রদায়িক কর্পোরেটের হামলা, ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সামাজিক অবদমন, জাতপাত ও লিঙ্গগত হিংসার মুখোমুখি হচ্ছে। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা উদ্বেগের বাস্তবতাকে স্বীকার করছি এবং আলোচনা থেকে যে আহ্বান রাখা হয়েছে তা সমর্থন করছি।

● আলোচনাসভা গণতন্ত্রের পরিসরকে প্রসারিত করার স্বার্থে বিভিন্ন লড়াকু শক্তির ঐক্য ও পারস্পরিক সংযোগকে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করছে।

● দেশ প্রত্যক্ষ করছে অধুনা নিয়মিতভাবেই মোদী সরকার এবং সংঘ পরিবারের তরফ থেকে অনেক লড়াইয়ের মূল্যে অর্জন করা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ নামছে, হামলা চলছে চলমান আন্দোলনগুলোর ওপরেও। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কেবল সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তাকেই বিঘ্নিত করছে না, বরং এখনও টিকে থাকা গণতান্ত্রিক অধিকার, বৈচিত্র্য এবং সমন্বয়ের সুরটিকেও আঘাত করছে।

● আফস্পা এবং ইউ এ পি এ-র মতো কালাকানুনগুলো, দেশের জনগণের ওপরেই চালানো সামরিক আগ্রাসন, আরক্ষাগারে থাকা মানুষজনের ওপর চালানো হিংসার ঘটনাবলীতে অভিযুক্তদের আড়াল করা এবং যে কোনও বিরোধী মতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মত ঘটনাগুলো বাড়তে থাকা স্বরতন্ত্রেরই পরিচায়ক।

● দলিত এবং আদিবাসীদের ওপর জাতপাত জনিত বিষয়কে কেন্দ্র করে হামলা বেড়েই চলেছে। মহিলাদের ওপর হিংসা এবং তাদের অধিকার সমূহের ওপর আক্রমণ বাড়ছে আরও ভয়ঙ্কর গতিতে। আর এগুলো রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণ এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

● সাম্রাজ্যবাদ দেশের শাসক এবং কর্পোরেট খিলাড়িদের সঙ্গে মিলেমিশে দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সামনের সমস্ত বাধাকে অপসারণ করতে যত্নবান হয়েছে।

● লড়াকু শক্তিগুলো এখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মোকাবিলা এবং জনগণের জমি, জীবিকা, স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের এক কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তারা চেষ্টা করছে স্বাস্থ্য,

তিনের পাতায় দেখুন

বর্ষীয়ান নেত্রী কমরেড গীতা দাস প্রয়াত

বর্ষীয়ান সি পি আই (এম এল) সংগঠক ও বিশেষত নারী আন্দোলনের দৃঢ়চেতা নেত্রী কমরেড গীতা দাস গত ২৪ অক্টোবর কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন। গত কয়েক বছর যাবত তিনি লাগাতার রোগের সাথে লড়াই চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে থেমে গেল তাঁর হৃদস্পন্দন। ২৪ তারিখে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বাড়িতে, তারপর দক্ষিণ শহরতলির বোড়াল শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন পুত্র, কন্যা সহ অন্যান্য পরিজনদের।

কমরেড গীতা দাসের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড স্বদেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাঁকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কার্তিক পাল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড পার্থ ঘোষ, রাজ্য কমিটি সদস্য জয়তু দেশমুখ, মীনা পাল, ইন্দ্রাণী দত্ত, নবকুমার বিশ্বাস, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড ধীরেশ গোস্বামী সহ কলকাতার আরও অনেক সাথী-সহযোদ্ধারা।

কমরেড গীতা দাস লাল সেলাম।

(শ্রদ্ধাঞ্জলি চারের পাতায়)

কাশ্মীর থেকে নিখোঁজ বীরভূমের নির্মাণ শ্রমিক হায়দার ও জুলফিকর

কাশ্মীরের বারামুলা থানার পুলিশ জুলফিকর ও হায়দারকে 'গ্রেপ্তার' করার পর তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে কিন্তু এখনও তাঁরা নিখোঁজ। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর থেকেই এ রাজ্যের মুসলিম জনসমুদয়ের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করতে উদয়াস্ত খেটে চলেছে কয়েকটি কর্পোরেট মিডিয়া হাউস। রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রাথমিক পর্বে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের কিছু তথ্য লোপাট করে বলে অভিযোগ উঠেছিল। তারপর থেকে নিয়া এবং এন এস জি অভিযান চলছে। হতদরিদ্র কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে। মাদ্রাসাগুলোতে অভিযান চালিয়ে কোন সন্ত্রাসবাদের প্রমাণ না পেলেও সমাজে চাগিয়ে দেওয়া গেল প্রবল ঘৃণা। প্রকৃত সত্য কখনও উদ্ঘাটিত হবে কিনা জানা নেই। বিস্ফোরণে মারা যাওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি শোভন মণ্ডল কে ছিলেন তা আর জানা গেল না, তার নাম ও নিশান আর মিডিয়ায় পাওয়া গেল না, কিন্তু নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের 'স্বভাব বৈশিষ্ট্য' নিয়ে অশ্লীল আলোচনা চলল এবং শেষে নিখোঁজ হয়ে গেল জুলফিকর ও হায়দার।

হায়দার কয়েক বছর যাবত কাশ্মীরে কাজ করতে যান। জুলফিকর মাস ছয়েক আগে প্রথমবার গেছিলেন। আরও অনেক যুবক কাজ করতে যান। মূলত টাইলস বসানোর কাজ করেন, নির্মাণ শ্রমিক। জুলফিকরের দাদা রবিউল প্রায় এক দশক কাজ করেন ওখানে। এঁরা তিনজন কাশ্মীরের কানিশপুরায় গৌসিয়া কলোনিতে যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন সেখানে গত ৬ অক্টোবর ইদুজ্জোহার রাতে সাধারণ পোশাক পরিহিত পুলিশ গিয়ে জলফিকর ও রবিউলকে ঘর থেকে ডেকে পুলিশ ভ্যানে তুলে বারমুলা থানায় নিয়ে যায়। কোন কোন বন্দুক চালাতে জানে তা নিয়ে জেরা করে পুলিশ। দুই ভাইকে চড়থাপ্পড় মারধোর করা হয়। তারপর রবিউলকে আবার বাড়িতে রেখে যায় এবং যাওয়ার সময় একটা উর্দু ফর্মে সই করিয়ে নেয়। জুলফিকরের খোঁজ নিতে পরদিন টাইলস দোকানের টিপু, ইঞ্জিনিয়ার বরকত সাহেব ও এলাকার তহশিলদার ও আরও কয়েকজনের মাধ্যমে রবিউল জানতে পারে যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গলের কেসে' জুলফিকরকে পুলিশ নিয়ে গেছে, জানতে পারে যে জুলফিকরের ফোন নাম্বারের সূত্রেই গ্রেপ্তার। পরদিন কাজে বের হওয়ার পর রবিউল হায়দারের জরুরি ফোন পেয়ে গৌসিয়া কলোনিতে ফিরে দেখে পুলিশ। রাতটা স্থানীয় বন্ধুর বাড়ি কাটিয়ে আতঙ্কিত রবিউল পরদিন বীরভুম রওনা দেন। ফিরে এসে গৌসিয়া কলোনির মানুষদের কাছ থেকে খবর পান যে হায়দারকেও পুলিশ নিয়ে গেছে।

বীরভূম জেলার মুরারই-১ ব্লকের নয়াগ্রামে জুলফিকর ও হায়দারের বাড়ি। এদের পাড়ার বেশীরভাগই ভূমিহীন বা প্রান্তিক কৃষক। স্থানীয় হাই মাদ্রাসার কয়েকজন শিক্ষক সহ পরিবারের মানুষেরা মুরারই থানায় যোগাযোগ করে বারামুলা থানায় ফোন করালে উত্তর আসে "আমরা কিছু করিনি, আমরা কেবল আই বি-কে এসিস্ট করেছি"। মুরারই থানার পুলিশ এই বিষয়ে ডায়েরি নিতে বারবার অস্বীকার করে। এরপর থেকে জুলফিকর ও হায়দারের আর কোন খোঁজ পায়নি পরিবারের মানুষ। কেবল রবিউল খেয়াল করতে পারে যে একটু আধটু কাশ্মীরী ভাষা জানার সুবাদে থানার আলোচনা থেকে সে বুঝেছিল যে শ্রীনগরের 'এয়ারকার্গোতে' জুলফিকরকে চালান করার কথা হচ্ছিল বারামুলা থানায়।

গত ২১ অক্টোবর সি পি আই (এম এল)

চারের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

‘পরিবর্তন’ আর ‘বিকল্প’র হানাহানির রাজনীতি

‘পরিবর্তন’ আর ‘বিকল্প’-র নামে পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রতিনিয়ত নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, হানাহানি আর রক্তাক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। দুই রাজ ক্ষমতার দখলদার পার্টির সংঘর্ষ চলছে। এই ছবিটা রাজ্যব্যাপীই, তবে মূল নিশানায় মূলত গ্রামবাংলা। গত এক সপ্তাহ ধরে সংবাদজগতে প্রধান খবর খাগড়াগড় টপকে ভাঙ্গাড় থেকে পাড়ুই—তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ থেকে তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ। সারদার একদফা চার্জশীট জমা পড়লেও তার পরিণতি সম্পর্কে অনেক সন্দেহজনিত প্রশ্ন জমে উঠছে। সারদা চর্চা ডিঙ্গিয়ে পরিস্থিতি তোলপাড় এখন প্রধানত তৃণমূল আর বিজেপির সম্মুখ সমর নিয়ে।

বামফ্রন্ট আমলের বিদায় আর তৃণমূল আমলের গোড়াপত্তনের সন্ধিক্ষণে স্বঘোষিত ‘মা-মাটি-মানুষের’ নেত্রী অনেক আওয়াজ দিয়েছিলেন। বামেরা চৌতিরিশ বছরে যা করেনি, ঘাসফুলের পার্টি তা চৌতিরিশ মাসেই করে দেখিয়ে দেবে। মা-মাটি-মানুষকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল চ্যালেঞ্জটা নেওয়া হবে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া আর উন্নয়ন নিয়ে আসার। এখন পরিষ্কার প্রমাণ হচ্ছে, মা-মাটি-মানুষের সাথে প্রতিশ্রুতির প্রতারণা করা হয়েছে; তৃণমূল রাজত্ব চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে ‘বদলের নয়’, বদলার, এবং দুর্নীতি-নৈরাজ্য-সন্ত্রাস চালানোর। হিসেবটা ছিল এরকম যে, সি পি এম জমানা এতই অধঃপতিত হয়ে বিদেয় হয়েছে যে ঐ বামেদের রাজ্য রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে ফিরে আসার আশু সম্ভাবনা নেই, মাওবাদীদের জঙ্গলমহলে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, পাহাড়েও ‘ভাগ কর-মোকাবিলা কর’ দাওয়াই কাজ দিচ্ছে; অতএব তৃণমূলী স্বৈর প্রবণতা হিলহিলিয়ে বাড়তে আর বাধা কোথায়? বামেদের মেরেধরে তৃণমূলীকরণ চলছিল। কিন্তু অন্তরায় হয়ে উঠল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়া বিজেপির ততোধিক উন্মত্ততা। প্রথম পর্বে যেখানে বামফ্রন্ট শরিকদের পেটের ভেতর থেকে তৃণমূল পল্লবিত হয়েছে, এখন সেখানে শুরু হয়েছে উত্তরপর্বের খেলা। একদিকে তৃণমূলের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার নাম করে, অন্যদিকে তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘাতকে পুঁজি করে অর্থাৎ তৃণমূলের ভেতর থেকেই গেরুয়াকরণ শুরু হয়ে গেছে। আর তার ফলেই এলাকা দখল-পুনর্দখলের রক্তবন্যা বয়ে যাচ্ছে।

আরাবুল ইসলামকে বহিষ্কারের পদক্ষেপে শাসক তৃণমূলের আদৌ শুদ্ধ-সিদ্ধ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত নেই, এটা করা হল একান্তই বাধ্য হয়ে। আরাবুর কেস শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে সেই ভয়ে। আরাবুলরা কখনই তৃণমূলের কাছে ব্রাত্য নয়। খোদ আরাবুলকে একবার হাজতে ঢোকানো হয়, আবার একটা সময়ে তাকে বারও করে আনা হয়েছে, সেই আরাবুল বেরিয়ে এসে আরও দশগুণ দুর্বৃত্তায়ন শুরু করে। তাই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত একদিকে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে, অন্যদিকে সাধু সাজার চমক দিতে। যে জনতা আগে দেখেছে মমতার ক্ষমতা, এখন দেখছে ক্ষমতার মমতা। তৃণমূলের মাফিয়াকরণ বা তৃণমূলে মাফিয়া নেতাদের চিহ্নিত করতে গেলে তৃণমূলই উজার হয়ে যাবে। খোদ নেত্রীও মদতদাতার কারণে নিষ্কলঙ্ক নন। চমক প্রদর্শন আর সাধু সাজায় নেত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দলের সুবেদাররাও কম যান না। যখন নন্দীগ্রামের রক্তে ভেজা রুক্ষ পটভূমিতে পূর্ব মেদিনীপুরে অধিকারী সাম্রাজ্যের সুবেদার দলের নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত দুর্নীতি ছেয়ে যাওয়া নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন, তখন ঐ জেলার আরেক উঠতি সুবেদার প্রতিক্রিয়া দিলেন, চোরের মায়ের বড় গলা। এই চেহারাটা রাজ্যের শাসকদলের সর্বত্র। তাই এক আধটা বহিষ্কার যা না করলেই নয় সেটুকুই করা হচ্ছে, আর বাকী সব চুপ করাও, ধামা চাপা দাও!

তৃণমূলের তৈরী অস্থির-অশান্ত-রক্তস্নাত পরিস্থিতির ফায়দা লুঠতে বিজেপি পুরোদমে নেমে পড়েছে। মোদীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পর বিজেপির পুরস্কৃত নবনির্বাচিত সভাপতি কুখ্যাত অমিত শাহ্‌র প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সফর ভোলার নয়। মুজফফরনগর মডেলে রাজনীতির সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদীকরণ ও হত্যালীলার মাধ্যমে ভোটব্যাঙ্কের মেরুকরণ হাসিলের ওস্তাদ অমিত শাহ্ এরাজ্যে এসে দলের ষড়যন্ত্রের ব্যাটারীতে পুরোমাত্রায় চার্জ দিয়ে যান। সেই চার্জেই এখানে বিজেপি দখলদারের অভিযান শুরু করছে। তারই পরিণামে খুনোখুনি রক্তারক্তিতে মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপি, কেষ্টব্রত বনাম দুধকুমার। বিজেপি প্রথম প্রথম যখন বামফ্রন্ট শরিকদের ঘর ভাঙ্গছিল, তখন তৃণমূল ঐ বামেদের ঘর সামলাতে বলে বেশ বিদ্রুপ উপভোগ করছিল। এখন বিজেপি ভাঙ্গছে তৃণমূলের গড়, আর তা সামাল দিতে তৃণমূল নিচ্ছে প্রতিহিংসার রাস্তা। কার্যত আসলে চলছে কেন্দ্র-রাজ্যের দুই শাসকদলের ক্ষমতার যুদ্ধ।

তৃণমূল যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে ‘পরিবর্তন’ নিয়ে আসার নামে কেমন প্রতারণাপন্থী। এখন বিজেপি ভেক ধরছে ‘বিকল্প’ কায়েমের সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানানোর। বলছে, এরাজ্যের মানুষ কংগ্রেস, সি পি এম, তৃণমূলকে চিনেছে, কিন্তু বিজেপিকে দেখেনি, তাই বিজেপিকে সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু বিজেপি কি জিনিস তার প্রমাণ বাবরি ধ্বংস থেকে গুজরাট সংখ্যালঘু গণহত্যা, মুজফফরনগর সংখ্যালঘু গণহত্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গে তার শুরু করে দেওয়া অপারেশন।

মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার রায় তাৎপর্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ

মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানাতে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা যে বেশ পেকে উঠেছে সেটা একরকম জানাই ছিল। বিগত দিনগুলোতে উভয় সরকারের বরাতেই জুটেছিল ভালোরকম কলঙ্ক এবং সাধারণ লোকেদের মনে হয়েছিল সরকারে থাকার সমস্ত রকম বৈধতাই তারা হারিয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার যে দুটি রাজ্য থেকেই চলে যাচ্ছে সেটা বুঝে যাওয়ার পর বিজেপি একলা চলো নীতিতে চলার ঝুঁকি নেয়। লক্ষ্য ছিল নিজের লাভের ঝুলি যতটা সম্ভব পূর্ণ করা। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে বিজেপি দুই রাজ্যেই প্রথম বারের জন্য সরকার গড়তে যাচ্ছে। সে হিসাবে বলাই যায় বিজেপির নেওয়া হিসেবী ঝুঁকি পুরস্কৃত হয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে আবারও মনে রাখতে হবে বিজেপির এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অসামঞ্জস্য (ভোটের শেয়ার ও প্রাপ্ত আসনের অনুপাতের নিরীখে)। মহারাষ্ট্রে বিজেপি ৩০ শতাংশের কম ভোট পেয়েছে আর হরিয়ানাতে পেয়েছে ৩৩ শতাংশ।

বিজেপির লাভ শুধু কংগ্রেসের ক্ষতির মূল্যেই আসেনি, এসেছে আঞ্চলিক দলগুলোর ক্ষয়ের বিনিময়েও। মহারাষ্ট্রে এন সি পি এবং মহারাষ্ট্র নির্মাণ সেনা এবং হরিয়ানাতে আই এন এল ডি এবং হরিয়ানা জনহিতকর কংগ্রেসের ক্ষয় থেকে বিজেপির ঝুলি ভরেছে। এমনকী শিবসেনার অল্প কিছু ভোট বাড়া বা মহারাষ্ট্রে নবনির্মাণ সেনাকে অনেকটাই গুরুত্বহীন করে দেওয়া সত্ত্বেও তারা মহারাষ্ট্রের সব অঞ্চলেই বিজেপির কাছে ম্লান হয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে সেনার শক্তিশালী দুর্গ মুম্বাইও। মহারাষ্ট্রে বিজেপির আসল লাভ হয়েছে সেনার সঙ্গে তার সম্পর্কের ভারসাম্য বদলের মধ্যে। ভোট পরবর্তী জোটে এখন শিবসেনাকেই হতে হবে বিজেপির অধস্তন সঙ্গী আর বিজেপির শর্তেই তাকে জোটে যেতে হবে কেননা বিধানসভায় বিজেপির আসন তার দ্বিগুণ। এন সি পি-র পক্ষ থেকে বিজেপিকে দেওয়া নিঃশর্ত সমর্থনের প্রস্তাব শিবসেনার দর কষাকষির ক্ষমতাকে আরও কমিয়ে দিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রচারযুদ্ধে আমরা বিজেপি, শিবসেনা, কংগ্রেস, এন সি পি এবং মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার মধ্যে তীব্র বিতণ্ডা লক্ষ্য করেছিলাম। প্রথমদিকে কংগ্রেস সমস্ত দুর্নীতির দায় এন সি পি-র ওপরেই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল আর বিজেপিও স্বাভাবিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত দল বলে এন সি পি-র ওপর কামান দেগেছিল। এন সি পি পাল্টা প্রচারে বিজেপির স্বৈরতান্ত্রিক হাবভাবের প্রসঙ্গ তুলে মোদীকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছিল। শিবসেনা এবং এম এন এস যুবদের জীবিকার প্রশ্নের সঙ্গে মারাঠা অস্মিতার সমন্বয় করে স্বভাবসিদ্ধভাবে উত্তর ভারতের যুব তথা জীবিকা প্রার্থীদের সম্পর্কে বিষোদগার করেছিল। এটা করতে গিয়েই তারা আবিষ্কার করেছিল এই প্রচার তাদের গুজরাটি পুঁজিপতিদের উল্টোদিকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে আর আমরা দেখলাম এন সি পি প্রথমেই বিজেপিকে নিঃশর্ত সমর্থন দিতে প্রস্তুত। নিমেষেই উন্মোচিত হয়ে গেল এন সি পি-র সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আর বিজেপির দুর্নীতি বিরোধী অবস্থানের আসল চেহারা। মহারাষ্ট্রে শেষমেশ যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই সরকার তৈরি হোক না কেন, নির্বাচনের আগে জোট ভাঙার মধ্য দিয়ে দলগুলোর যে উন্মোচন শুরু হয়েছিল, এখন তার চেয়ে কম কিছু হবে না।

মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানাতে বিজেপির চমকপ্রদ সাফল্য দল ও সরকারের ওপর মোদী-অমিত শাহ জুটির নিয়ন্ত্রণকেই আরও পাকাপোক্ত করবে। ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের মতো রাজ্যে, যেখানে তারা অতীতে ক্ষমতার অংশীদার ছিল সেখানে তো বটেই, তাছাড়াও হিন্দী বলয়ের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, তামিলনাড়ু বা কেরালার মতো রাজ্যে, যেখানে তাদের উপস্থিতি তত প্রবল নয়, সেখানেও বিজেপি এবার ক্ষমতার লক্ষ্যে ঝাঁপাবে। নীতি এবং আইনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব সরকার এবার যাবতীয় বিরোধিতাকে ধূলিস্যাৎ করে কর্পোরেট বান্ধব নীতিমালাকে প্রণয়ন করতে এগোবে। জনগণকেও তাদের জীবিন জীবিকা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বার্থ রক্ষার্থে বিজেপির কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মোকাবিলায় নামতে হবে।

অনেকদিন ধরেই ভারতের বুর্জোয়া রাজনীতির বিরোধীরা কংগ্রেস বিরোধিতার অক্ষ ধরে এগিয়েছে। ১৯৯০ থেকে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির শক্তিশালী উত্থানের পর তাতে কংগ্রেস-বিরোধী বিজেপি-বিরোধী অক্ষ তৈরির ঝোঁকও দেখা গেছে। বর্তমানে বিজেপি যখন দেশজুড়েই শাসকশ্রেণীর প্রথম পছন্দের দল হয়ে উঠেছে, তখন বিরোধী রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধিতার সুরই প্রবল হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু কংগ্রেসের পতন যখন অব্যাহত আর আঞ্চলিক দলগুলোর বিজেপিকে আটকানোর মত কোনও মতাদর্শগত রাজনীতিগত জোর নেই, তখন বিভক্ত বিরোধীপক্ষের দিক থেকে বিজেপি বিরোধিতার সুরে ঐক্যবদ্ধ হওয়া শক্ত।

যাই হোক না কেন, কংগ্রেস বিরোধিতা বা বিজেপি বিরোধিতার সীমাবদ্ধ রাজনীতির মধ্যে বামেদের বৈপ্লবিক সামাজিক রূপান্তরের রাজনীতি আবদ্ধ হতে পারে না, স্থান পেতে পারে না বিকল্প গণতান্ত্রিক পরিসর নির্মাণ বা অ-শাসক, অ-শোষক শ্রেণীগুলোর বিকল্প রাজনীতির পরিসরটি। ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অভূতপূর্ব উত্থান দক্ষিণপন্থী রাজনীতির এক মতাদর্শগত ঘনীভবনের সূচক। বামেদের অবশ্যই বিজেপি বিরোধী সাহসী এবং ব্যাপকতর গণবিকল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিজেপির কর্পোরেট বান্ধব আর্থিক নীতি, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন সংখ্যাগুরু জাতীয়তাবাদ এবং পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অ্যাজেণ্ডাগুলোর মোকাবিলার জন্য মতাদর্শে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২১ অক্টোবর ২০১৪)

মহারাষ্ট্র বিধানসভা অপরাধীদের লীলাক্ষেত্র!

মহারাষ্ট্রের নবনির্বাচিত বিধানসভা দুষ্কৃতিদের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠল!

● মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যার নাম মনোনীত হয়েছে, সেই বিজেপি নেতা **দেবেন্দ্র ফড়নবিস্-এর বিরুদ্ধে ২২টি দাঙ্গা বাঁধানোর কেস নথিভুক্ত হয়েছে।**

● জিতেন্দ্র আওয়াদ—এন সি পি-র এই বিধায়কের বিরুদ্ধে ১৫টি ফৌজদারী মামলা রয়েছে, অপহরণ সহ।

● ২০ জন মহিলা বিধায়কের মধ্যে ৭ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা, আর আরও ৫ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের কেস রয়েছে, এমনকি মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো পর্যন্ত।

● **২৮৮টি সদস্য বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রের বিধানসভায় ১৬৫ জন সদস্যের বিরুদ্ধে নানা অপরাধ সংক্রান্ত মামলা রয়েছে যা ৫৭ শতাংশ।**

● অতীতের তুলনায় এবারে বিধানসভায় নির্বাচিত বিধায়কদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা সর্বোচ্চ—**২০০৪ সালে ছিল ৪৬ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৫২ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৫৭ শতাংশ।**

● ১৬৫ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত যে মামলা রয়েছে, তার মধ্যে ১১৫ জন বিধায়কের (অর্থাৎ ৭০ শতাংশ) বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, জালিয়াতি, দাঙ্গা লাগানো প্রভৃতি অভিযোগ নিয়েই তারা নির্বাচিত হয়েছেন।

● বিজেপির নির্বাচিত ১২২ জন বিধায়কের মধ্যে ৭৪ জনের বিরুদ্ধে, শিবসেনার ৬৩ জন বিধায়কের মধ্যে ৪৮ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে।

(সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করা প্রার্থীদের হলফনামা থেকে)

কলেবর বাড়ছে কোটিপতি প্রার্থীদের!

দেশের সংসদীয় ও বিধানসভা নির্বাচনে ক্রমেই বেড়ে চলেছে কোটিপতি প্রার্থীদের সংখ্যা! সদ্য যে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল তাতে অবিশ্বাস্য মাত্রায় কোটিপতি প্রার্থীরা মনোনয়ন পেয়েছিল! ঐ রাজ্যে ২০০৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল ৩৮০, আর এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৬৩। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে কোটিপতি প্রার্থীর অংশ বেড়েছে ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশ। যে ৬৭ জন গতবারের বিধায়ক এবারও প্রার্থী হয়েছিল তাদের বিগত পাঁচ বছরে সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে ১৫৬ শতাংশ। ২০০৯ সালে সমস্ত প্রার্থীর গড় সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২.০৫ কোটি টাকা, এবারে গড় সম্পত্তির পরিমাণ ৪.৫৪ কোটি টাকা। সবচেয়ে ধনী মহিলা প্রার্থী সাবিত্রী জিন্দলের সম্পত্তির পরিমাণ ১১৩ কোটি টাকা। (তথসূত্র ঃ এ ডি আর) (ইকনমিক টাইমস্)

বিহারে ক্রমেই বাড়ছে সামন্ত হিংসা
প্রত্যুত্তরে "ন্যায় মার্চ"

বিহারে সমাজের অত্যাচারিত ও প্রান্তিক অংশের মানুষেরা অনেক আশা করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী জীতন রাম মাঝি নিজের মহাদলিত সম্প্রদায়জাত। সুতরাং বিহিত কিছু মিলতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক নেমে আসা অত্যাচারের ঘটনাবলীতে সমস্ত আশা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তার মধ্যে অতি সাম্প্রতিক একটা ঘটনা হল শ্রীরাম নামে মাত্র ১২ বছরের এক দলিত বালককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অপরাধ হল তার ছাগলটা জমিদারের খেতে ঢুকে পড়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছে রোহতাস জেলার কারাকাটে মোহনপুরে। এভাবে বিহারে আজও গরিবদের মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের আকাঙ্খাকে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। তবে সেটা প্রতিবাদ-প্রত্যুত্তরেরও সম্মুখীন হচ্ছে। সি পি আই (এম এল) সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর গ্রামীণ গরিব ও মহিলারা পাল্টা জোরালো তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন। এই সমস্ত প্রতিবাদের ধারা হিসেবেই পুরার ঘটনার বিরুদ্ধে ১০ অক্টোবর টিক্‌রিতে সংগঠিত হয় এক মার্চ, তারপরে কুরমুরির গণধর্ষণের বিরুদ্ধে ১৩ অক্টোবর ভোজপুর বন্‌ধ হয়, পাটনাতে ১৭ অক্টোবর বের হয় ন্যায় মার্চ, তেমনি ১৮ অক্টোবর ডুমুরিয়াতেও মার্চ সংগঠিত হয়। ডুমুরিয়া গ্রামে একইদিনে অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর এক প্রতিবাদ সভা করা হয়, ঐ গ্রামেই গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। জীবন্ত দগ্ধ মৃত বালক শ্রীরামের হত্যার বিরুদ্ধেও রোহতাস জেলায় বন্‌ধ হয়।

পার্টনায় সংগঠিত ১৭ অক্টোবরের ন্যায় মার্চে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন নেতৃবৃন্দ সহ অংশগ্রহণ করে সি পি এম, এস ইউ সি, জনগণের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের প্রতিনিধিরা এবং অনেক সাংবাদিক সাথী বন্ধুরা। ঐ মার্চ থেকে আহ্বান জানানো হয় বিহারে সামন্ত হিংসার মোকাবিলায় এক হও, লড়াই কর। হাজার হাজার জনগণ মিছিলে সামিল হন। মিছিল গান্ধী ময়দান থেকে বের হয়ে পাটনার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ঘুরে আর ব্লক চত্বরের দিকে যায়। মিছিল যত এগিয়েছে লোক তত বেড়েছে। সামনের সারিতে ছিলেন সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক কমরেড দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বিহার রাজ্য সম্পাদক কুণাল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রামযতন শর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রামেশ্বর প্রসাদ, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মীনা তেওয়ারি, অখিল ভারতীয় কিষাণ মহাসভার সর্বভারতীয় সম্পাদক রাজারাম সিং, মহিলা সমিতির বিহার সভাপতি সরোজ চৌবে, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইসার) নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক চিন্টু প্রমুখ আরও অনেকে। ছিলেন সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক, ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য, এস ইউ সি-র রাজ্য কমিটির সদস্য, সাংবাদিক নিবেদিতা শাকিল, এন এ পি এম-এর আশীষ, সমাজকর্মী সুধা ভার্গিস এবং আরও অনেকেই। আর ব্লক চত্বরে সমাবেশ সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড রাজারাম, সঞ্চালনায় ছিলেন কমরেড কমলেশ শর্মা। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক রাজারাম সিং, সর্বোদয় শর্মা (সি পি এম), নিবেদিতা শাকিল, চিন্টু, কিষাণ সভার নেতা সুদামা প্রসাদ, গয়া জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন কুমার, প্রাক্তন সাংসদ রামেশ্বর প্রসাদ, মীনা তেওয়ারি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ন্যায় মার্চ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বিহারে যে বর্বর সামন্ত অত্যাচার বেড়ে চলেছে তার প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে, সেইসঙ্গে দাবি করা হয়েছে বিহার সরকারকে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঐ সমস্ত হিংসা ও উৎপীড়নের অবসান নিশ্চিত করতে হবে; একইসাথে পুড়া ও কুরমুরির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার সহ যারাই ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়াকে বানচাল করা এবং গরিব ও দলিতদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সময়োচিত সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছে, আমির দাস কমিশনকে পুনর্বহাল করতে হবে যাতে হত্যালীলা চালানো দাগীরা আর তাদের রাজনৈতিক সুরক্ষাদাতারা বকেয়া শাস্তি পায়। ন্যায় মার্চ থেকে এই দাবিও তোলা হয়েছে যে, বিহারে যেখানে যত গরিব পরিবার সামন্তী শক্তিগুলোর দ্বারা উচ্ছেদ হয়েছে, তেমনি পাটনা হাইকোর্টের আদেশের জোরে সৌন্দর্যায়নের নামে যত শহুরে গরিবদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, এদের সকলকেই অবশ্যই পুনর্বাসন দিতে হবে। প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সামন্ত শক্তিগুলোর দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন গণহত্যার জন্য দাগী অপরাধীরা যেখানে বেমালুম খালাস পেয়ে যাচ্ছে, অথচ আরওয়াল জেলার ভাদাসী মামলায় টাডা আইনে ১৪ জন নিরীহ মানুষ যাবজ্জীবন দণ্ড ভোগ করছেন। ন্যায় মার্চ দাবি তুলেছে সমস্ত টাডা বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

কুরমুরি ধর্ষণকাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৮ অক্টোবর ন্যায় মার্চ হয় সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের আরা অফিস থেকে ডুমুরিয়া গ্রাম পর্যন্ত। মিছিলে সামিল হন শত শত মানুষ, বিশাল সংখ্যায় মোটর সাইকেল, পথে পথে আরও আরও জনতা মিছিলে যোগ দিতে দিতে চলেন। যেসব জেলা দিয়ে মিছিল গেছে সেখানে ছবিটা তৈরী হয়ে যায় যেন লাল জনসমুদ্র। ডুমুরিয়ায় করা হয় জনপ্রতিবাদ সভা। সেই সভা থেকে মহাদলিত, গরিব ও মহিলা সমন্বয়ে কয়েক হাজার জনতা ধর্ষণকারীদের কঠিন শাস্তি দেওয়ার দাবিতে সমস্বরে সোচ্চার হন। সভা শুরু হওয়ার আগে সি পি আই (এম এল) নেতৃবৃন্দ ধর্ষিতাদের পরিবারবর্গের সাথে সাক্ষাত করেন।

ডুমুরিয়ার জনগণের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে উঠে সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক ধর্ষণের শিকার হওয়া মহিলাদের সেলাম জানান। এ জন্যই যে, তাঁরা তাঁদের উপর সংঘটিত নিগ্রহ নিয়ে আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সরব হওয়ার সাহস দেখিয়েছেন। যে হিম্মৎ এমনকি কিছুদিন আগে তাঁকেও অপদস্থ করা সত্ত্বেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জীতন রাম মাঝি ভোট এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়ার ভয়ে এ যাত্রায় দেখাতে পারলেন না। কমরেড দীপঙ্কর আরও বলেন, জে ডি (ইউ)-র মতন তথাকথিত 'ন্যায় বিচার'-এর বিধান দেওয়ার দলগুলো নিজেরাই অন্যায় করে, অন্যায় হজম করে এবং ভোটের স্বার্থে সামন্ত-অপরাধীদের সুরক্ষা দেয়। তিনি বলেন, কুরমুরি ধর্ষণের ঘটনা বিহারে সমস্ত পার্টির আসল চেহারাগুলো খুলে দিয়েছে। নীতীশ যেখানে বিহারে মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করে দেওয়ার কৃতিত্ব জাহির করছে, তখন প্রকৃত সত্যটা হল যুবতী মেয়েদের জীবিকার জন্য কাগজ কুড়োতে বের হতে হচ্ছে এবং তাদের জীবনে দুর্ভোগের শেষ নেই। লালু যাদবের আমলে পরের পর গণহত্যা হয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্টের আদেশে সমস্ত অপরাধীদেরই খালাস করে দেওয়া হয়েছে নীতীশ আমলে। আমির দাস কমিশন প্রত্যাহার করে নেওয়াটা সামন্ত শক্তিগুলোকে মদত জুগিয়েছে। তারপরে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিজয় এবং কেন্দ্রে মোদী সরকার কায়েম হওয়াতেও সামন্ত শক্তিগুলো খুবই উজ্জীবিত হয়েছে। তাই তারা এখন মহাদলিত, গরিব, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করছে নির্ভয়ে। কমরেড দীপঙ্কর তাঁর বক্তব্য শেষ করেন একথা বলে যে, বিজেপিকে ও তার মদতপুষ্ট সামন্ত-অপরাধী শক্তিগুলোকে যোগ্য জবাব দেওয়াই আজ সময়ের দাবি।

ত্রিলোকপুরীতে সাম্প্রদায়িক হিংসা
সি পি আই (এম এল) বিবৃতি

নয়া দিল্লী, ২৭ অক্টোবর'১৪

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের একটি দল গত ২৬ অক্টোবর ত্রিলোকপুরীর আক্রান্ত এলাকা এবং পূর্ব দিল্লীর অন্যান্য অঞ্চলে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময়ে তাঁরা লক্ষ করেন যে, ঐ এলাকায় তেমন কোন দীর্ঘমেয়াদী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা ছিল না। বরং দীপাবলীর রাত্রে মদ্যপান করার পর ঝুট-ঝামেলা বাধানোর কিছু তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছিল। ২৩ অক্টোবর রাতেই ঐ সমস্ত ঝগড়াঝাঁটিকে সামাল দেওয়া হয়। কিন্তু পরিকল্পিতভাবেই, ২৪ অক্টোবর সকাল থেকে পাথর ছোঁড়া ও লুঠপাট শুরু হয়, আর তা ২৪ ও ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলতে থাকে। এইভাবে তুচ্ছ এক ঝগড়া ও ঝামেলাকে এক সাম্প্রদায়িক রং দেওয়া হয়। আর গুজবের উপর ভর করে হিংসা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ যদি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে না থাকত, তবে ধারাবাহিক এই হিংসা বজায় থাকত না।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন যে, এই হিংসাকে উস্কানি দিতে ও অব্যাহত রাখতে পরিচিত লুম্পেনরা যুক্ত ছিল। তারা বিশেষভাবে এই হিংসার উস্কানিদাতা হিসাবে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক সুনীল বৈদ্যর নাম উল্লেখ করেছেন।

স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন যে, কিভাবে পুলিশ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিরপরাধ মানুষ, স্থানীয় বাসিন্দা, এমনকি মহিলাদের বিরুদ্ধেও হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়েছে, পুরুষ পুলিশরা কিভাবে মহিলাদের পিটিয়েছে। আসল উস্কানিদাতা ও হিংসার মদতদাতারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর অন্যদিকে, বেশীরভাগ মানুষ যাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে গেছে তারা সকলেই নির্দোষ।

উভয় সম্প্রদায়ের নির্দোষ মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগই গ্রেপ্তার হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন। যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন (প্রায় ৭০ জন), তাদের ৩০৭ ধারার মতন (খুনের চেষ্টা) গুরুতর ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। হিংসাত্মক ঘটনার প্রকৃত তদন্ত না করেই ৩০৭ ধারার যথেচ্ছ ও ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে যে, দেশের রাজধানীতে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটার পরও কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিলোকপুরী পরিদর্শনে গেলেন না? শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায় যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের, তেমনি হিংসাত্মক ঘটনাকে প্রতিহত করে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার প্রশ্নে ব্যর্থতার দায়ও বর্তায় তার ওপর।

বিজেপি-র প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল বৈদ্য এবং শাসকদলের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে সি পি আই (এম এল) তদন্তের দাবি জানাচ্ছে, যাদের এই হিংসাত্মক ঘটনায় ইন্ধন যোগানোর পেছনে হাত রয়েছে। যেসমস্ত মানুষকে নানান মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে, কারণ তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুপস্থিত। মহিলাদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ হিংসা চালানোর কারণে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপকে ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় ঐ অঞ্চলের পুলিশের ডি সি-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

দিল্লীতে আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে, ভোটের লক্ষ্যে ঘৃণা ছড়িয়ে মেরুকরণ ঘটানোর পেছনে বিজেপি-র যে পরিকল্পিত রণনীতি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে দিল্লীর নাগরিকদের সজাগ থাকতে হবে। গুজবের বিরুদ্ধে, দৈনন্দিন ছোটখাটো ঘটনাগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাঙ্গায় রূপান্তরিত করার সমস্ত ধরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকদের সজাগ থাকতে হবে।

... গণতান্ত্রিক মঞ্চ অভিমুখে

একের পাতার পর

শিক্ষা, খাদ্য, মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার দাবিগুলোকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে জনগণ কেন্দ্রীক এক বিকল্প উন্নয়নের রূপরেখাকে সামনে নিয়ে আসার।

● বর্তমান সময়টিকে যদি তমশাচ্ছন্ন বলে বোধ হয়, তবে উজ্জ্বল সময়ের প্রতিফলন দেখা সম্ভব জনগণের রাস্তায় নেমে শক্তিশালী প্রতিরোধী লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই। আমরা মনে করি গণ আন্দোলনের এক বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মঞ্চ হল এই সময়ের দাবি। সারা ভারত গণমঞ্চ (ইংরাজীতে অল ইণ্ডিয়া পিপলস ফোরাম এবং হিন্দীতে অখিল ভারতীয় জনমঞ্চ) নামে এই ধরণের এক মঞ্চ গঠনের জন্য আমরা দিল্লীতে ২০১৫-এর গোড়ায় একটি সম্মেলন করার প্রস্তাব গ্রহণ করছি। আমরা সমস্ত সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস রাখি আমরা লড়ব এবং জিতব।

স্বাক্ষরকারী সংগঠন ও নাম ঃ

এন ডি পাঞ্চলি (সিটিজেন্স ফর ডেমোক্রেসী এবং পি ইউ সি এল), জন দয়াল, বিনায়ক সেন (পি ইউ সি এল/এম এফ সি), মেহের ইঞ্জিনিয়ার, অনিল সদ্‌গোপাল (এ আই এফ আর টি ই), সুমিত চক্রবর্তী (মেইনস্ট্রিম), গৌতম নভালকা, আনন্দ তেলতুম্বে, আনন্দ পট্টবর্ধন, অনিল চামাড়িয়া, রাজেন্দ্র চৌধুরী (শিক্ষাবিদ ও সক্রিয় কর্মী, রোহটক); কবিতা কৃষ্ণাণ (এ আই পি ডব্লিউ এ), এস পি উদয়কুমার (পি এম এ এন ই), অখিল গগৈ (কে এম এস এস), দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (সি পি আই (এম এল) লিবারেশন), বিজয় প্রতাপ, অম্বরিশ কুমার, দর্শনা পাঠক, সঞ্জয় কানোজিয়া (সমাজবাদী সমাগম), ডাঃ প্রেম সিং (সোশ্যালিস্ট পার্টি ইণ্ডিয়া), মঙ্গত রাম পাসলা (সি পি এম পাঞ্জাব), গোবিন্দ ছেত্রী (সি পি আর এম, দার্জিলিং), রহিত (লেফট কালেক্টিভ), কে এস হরিহরণ (আর এম পি, কেরালা), ভিমরাও বনসোড়ে (লাল নিশান পার্টি লেনিনবাদী, মহারাষ্ট্র), রাজীব (রিহাই মঞ্চ, ইউ পি), ফাদার টি কে জন, মহম্মদ ইফটিকার আলম ও সুরজ কুমার সিং (ইনসাফ মঞ্চ, বিহার), পুরুষোত্তম রয় বর্মণ (সম্পাদক, ত্রিপুরা মানবাধিকার সংগঠন), ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ (পি ইউ সি এল এবং কর্ণাটক কৌমু সৌহার্দ বেদিক), গৌতম মোদী (এন টি ইউ আই), রমা (এ আই ইউ এফ ডব্লিউ পি), মহম্মদ সেলিম (ইনকিলাবি মুসলিম কনফারেন্স), অনন্ত প্রকাশ নারায়ণ (জে এন ইউ এস ইউ), ওমপ্রসাদ ও সন্দীপ সৌরভ (আইসা), স্বপন মুখার্জী (এ আই সি সি টি ইউ), রামজী রাই, সুধীর সুমন (সমকালীন জনমত), প্রণয়কৃষ্ণ (জনসংস্কৃতি মঞ্চ), ধীরেন্দ্র ঝা (আয়ালা), অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল লখেশ্বর মিশ্র, রাধিকা মেনন (জে এস এম, এ আই এফ আর টি ই), ডাঃ মংভি রংপি (ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর অটোনোমাস স্টেট, কার্বি আংলং), রাধাকান্ত শেঠি (এ আই সি সি টি ইউ, উড়িষ্যা), রফিক জোব্বার মোল্লা (এস ডি পি আই), হরমিন্দর সিং অহলুওয়ালিয়া (শিখ ইউথ ফোরাম), কানোয়াল জিৎ সিং (আর ওয়াই এ), নবকিরণ নাঠ (ক্রান্তিকারি কামকাজি মহিলা সংগঠন, চণ্ডিগড়), কে ডি যাদব, ফুলচাঁদ দেওয়া (অখিল ভারতীয় কিষাণ মহাসভা), গুরনাম সিং দাউদ (দেহাতি মজদুর সভা), ওম দত্ত সিং (দমন বিরোধী মঞ্চ, এলাহাবাদ), ভি শঙ্কর (এ আই সি সি টি ইউ), অমর সিং, অরুণ মাজি, নাদিম (শ্রুতি), তিলোক সিং (জি আই ই এ-এন জেড), অমিত শ্রীবাস্তব (পি ইউ সি এল, দিল্লী)

পোলবায় আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সি পি আই (এম এল)

আশ্বিন মাসের যে সময়টা সারা বাংলা জুড়ে মাতৃ আরাধনার রমরমা, এই লেখা যখন প্রকাশ হবে তখন কালী পূজো সাঙ্গ হয়েছে, সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে লক্ষ্মী পূজো, দুর্গা পুজো, ঠিক সেই সময়ে পোলবা ব্লকের বরুনানপাড়ায় (চলতিতে বন্নোপাড়া) এক আদিবাসী ক্ষেতমজুর রমণী, তাঁর নামও ধরা যাক দূর্গা (পরিবর্তিত) গণধর্ষিতা হলেন। হিন্দুধর্মের নারী শক্তির ক্ষমতায়নের সমস্ত কল্পকথার বিপরীতে সমাজে পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যের কদর্য চেহারাকে আরেকবার নগ্ন করল এই ঘটনা। আরও একবার পুলিশ-প্রশাসন-শাসকদলের আঁতাতে ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা, আরও একবার ধর্ষিতা মহিলাকে দুশ্চরিত্রা বলে চিত্রিত করা এবং আরও একবার ধর্ষণে অভিযুক্তরা সকলেই তৃণমূল আশ্রিত।

গত ১৩ অক্টোবর, রবিবার সন্ধ্যেবেলায় হাট থেকে ফেরার সময় দূর্গাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষিতাকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিলো যে ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে নেয়। এর পরেই আসরে নেমে পড়ে চুঁচুড়ায় বসবাসকারী 'স্বনামধন্য' তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতা ও বিধায়ক। ঐ বিধায়ক এবং তার সুরে সুর মিলিয়ে পোলবা থানার ওসি সমস্ত ঘটনাকে সাজানো বলে দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় না। পোলবা ব্লকের সি পি আই (এম এল)-এর কর্মী বিশ্বনাথ সোরেন এলাকায় যায় এবং স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে থানাতেও যায়। সি পি আই (এম এল)-এর জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার চুঁচুড়ায় সংগঠক স্বপন গুহকে নিয়ে হাসপাতালে মহিলার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন আর এখান থেকেই পৌঁছে যাওয়া ঐ গ্রামে।

বরুনানপাড়া এক আদিবাসী গ্রাম। গ্রামের পুরুষ-মহিলা সকলেই ক্ষেতমজুর। ৬০ ঘর আদিবাসী পরিবার এখানে বসবাস করেন। বালি খাদের এক বড় পুকুরে গ্রামের ২১টি পরিবার যৌথভাবে বিগত কয়েক দশক ধরে মাছ চাষ করছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রামের গ্রামসভার ২টি আসনেই সি পি এম জয়ী হয়। পরিদর্শনকারি যখন পৌঁছায় গ্রামের বেশীরভাগ মহিলাই তখন চুঁচুড়ায়। বৃষ্টি পড়ছিল বলে উপস্থিত মহিলারা আমাদের দাওয়াতে চেয়ার পেতে বসতে দিল। গ্রামে থেকে যাওয়া স্কুলে পড়া অল্পবয়সী মেয়েগুলোর অপাপবিদ্ধ ভাসা ভাসা চোখেও আতঙ্কের ছায়া। এক বৃদ্ধা যেন সবার হয়ে তাঁদের অসহায়তার কথা তুলে ধরল, 'তোমরা কিছু করো বাবা'। স্থানীয় ক্লাবে গিয়ে পুরুষদের সঙ্গেও কথা হয়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন সি পি এমের পঞ্চায়েত সদস্য পগার মুর্মু, তিনি জানান পুলিশ থেকে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য। তিনি এও জানান সি পি এম থেকে চুঁচুড়ায় আজ এর বিরুদ্ধে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে যেখানে গ্রামের মহিলারা যোগ দেবেন এবং তিনিও সেখানে যাবেন। পরে আমরা জানতে পারি, গ্রামের মহিলাদের হাসপাতাল থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে আর চুঁচুড়ার সি পি এমের মহিলা নেত্রীরা ধর্ষিতা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে এবং এক প্রতিনিধিদল জেলা পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দিয়ে তাঁদের দায় সেরেছেন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষকে সামিল করে প্রতিবাদের হিম্মত তাঁরা খুইয়েছেন। অথচ গ্রামের মানুষ লড়তে চাইছেন। আমাদের পোলবা থানা ও জেলা পুলিশ সুপারের কাছে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে তাঁরা যুক্ত হন। পোলবা থানায় ১৫ অক্টোবর প্রগতিশীল মহিলা সমিতি, ক্ষেতমজুর সমিতি ও পার্টির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো ও দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে ওসি-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ঐ দিন সকালে স্থানীয় সংগঠক গোপাল রায় ও জেলা ক্ষেতমজুর সমিতির সম্পাদক নিরঞ্জন বাগ, পার্টির ব্লকের দায়িত্বশীল শুভাশিস চ্যাটার্জী এলাকার মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ও থানা কর্মসূচীতে যোগদানের আবেদন জানান। উপরোউক্ত কমরেডরা ছাড়াও থানার কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন পার্টির জেলা নেতা সজল অধিকারী, নেত্রী চৈতালী সেন, শিপ্রা চ্যাটার্জী সহ ঐ গ্রামের ১৫ জন মহিলা ও পুরুষেরা। তৃণমূল বিধায়ক সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করার উদ্দেশ্যে এলাকায় হাজির হন, সি পি আই (এম এল)-কে রুখতে 'বহিরাগতদের' গ্রামে ঢোকা চলবে না হুমকি দেন, এমনকি এও বলেন হাসপাতালের ডাক্তার আমার হাতের মুঠোয় যা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় মেডিক্যাল রিপোর্ট পাল্টে দেওয়ার। স্মারকলিপি প্রদানকালে ওসি জানান ধর্ষণের প্রমাণ মিললে তবেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে। ওসি-র সঙ্গে বাদানুবাদে এটা বোঝা যায় শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে তিনি চলছেন। ১৭ অক্টোবর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ঘড়ির মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল এস পি অফিসের সামনে পৌঁছায়। গাড়ি ভাড়া করে এসে এই কর্মসূচীতে যোগ দেন পঞ্চায়েত সদস্য পগার মুর্মু সহ গ্রামের ৫০ জন মহিলা। পগার মুর্মু এই লড়াই চালানোর জন্য তার বক্তব্যে সি পি আই (এম এল)-কে ধন্যবাদ জানান। বরুনানপাড়া থেকে আসা লড়াকু মহিলা চন্দনা বাস্কে প্রথমে বাংলা ও পরে সাঁওতালি ভাষায় তাদের দুঃখ ও ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন। প্রথমে ঘড়ির মোড়ে ও পরে এস পি অফিসের সামনে চলা বিক্ষোভ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, সজল অধিকারী, নেত্রী শোভা ব্যানার্জী, পাপিয়া ঘোষ, দীপঙ্কর সেনগুপ্ত, বটকৃষ্ণ দাস, সুভাষ অধিকারী। চৈতালী সেন, সজল অধিকারী, পগার মুর্মু, চন্দনা বাস্কে সহ ৭ সদস্যের প্রতিনিধিদল এস পি-র কাছে ডেপুটেশন দিতে যায়। দোষীদের গ্রেপ্তার, অসুস্থ থাকার কারণে কর্মহীন ধর্ষিতা মহিলাকে ক্ষতিপূরণ, তাঁর ও পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থার দাবির পাশাপাশি পরিবারের অগোচরে হাসপাতাল থেকে রোগীকে পোলবা থানা থেকে এসে নিয়ে যাওয়ার মতো অমানবিক কাজের প্রতিবাদ করা হয়। এস পি-র অনুপস্থিতিতে ডি এস পি (হেড কোয়ার্টার) স্মারকলিপি গ্রহণ করে। ডি এস পি-র মুখেও এক রা। কোনও সংবেদনশীলতা পুলিশ আধিকারিকদের থেকে মুর্খরাও আশা করে না। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের রায়কে তোয়াক্কা না করা, তদন্তে ধর্ষণের সময় ধর্ষিতার পরণের কাপড়গুলো সংগ্রহ না করা ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযুক্ত তথা শাসকদলকে তোয়াজ করার নির্লজ্জ নিদর্শন পুলিশ প্রশাসনের সর্বত্র পরিলক্ষিত হল। পুলিশ-প্রশাসন-শাসকদলের আঁতাতের বিরুদ্ধে গরিব অসহায় মানুষদের এক অসম লড়াই, সেই সমস্ত গরিব মানুষ যাঁরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি অথবা 'দোষীদের শাস্তি চাই' শ্লোগানের সাথে সাথে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে গলা মেলাচ্ছিল, যে অভিব্যক্তি বামপন্থার সাথে তাঁদের স্বাভাবিক আত্মিক সম্পর্ক জানান দিচ্ছিল।

এ লড়াই লড়তে হবে। জিততেই হবে।

লেখা-রিপোর্ট-প্রতিবেদন
সবকিছু পাঠান ই-মেইলের মাধ্যমে
e-mail : deshabrati@gmail.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কমরেড গীতা দাস অমর রহে

কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেত্রী কমরেড গীতা দাস যিনি সবার প্রিয় গীতাদি বলেই পরিচিত, বার্ধক্যজনিত দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৪ অক্টোবর সন্তোষপুরে তাঁর ছোট মেয়ের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালি পাড়ায়। প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পেরেছিলেন। পড়াশোনা করার ব্যাপারে ছিল তাঁর একাগ্রতা ও জেদ। বিয়ের পর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেন, ছোট সন্তানকে ঘরে রেখে হস্টেলে থেকে বেসিক টিচার্স ট্রেনিং কোর্স করেন এবং ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। এরপরে তিনি কলকাতার কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

কমরেড গীতা দাসের বাড়ির প্রত্যেকেই বামপন্থী ভাবাদর্শের সাথে যুক্ত ছিলেন। সি পি আই-এর সময় থেকেই তাঁদের বাড়িতে বহু কমরেডদের আসা যাওয়া ছিল। বিয়েও করেন বামপন্থী কর্মী দিলীপ দাসকে। এরপর যখন নকশালবাড়ির আন্দোলনে রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতি তোলপাড়, তাঁর চার ভাই-বোন ঘর ছেড়ে বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেই সময় বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সাথে কমরেডদের কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা করে গেছেন। গোপনে জেলের কমরেডদের সাথে চিঠি আদান প্রদান করতে যেতেন নির্ভীক গীতাদি। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পারিবারিক নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তিনি ছিলেন দৃঢ় স্বাধীনচেতা নারী। পরিবার ও সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আপসহীন লড়াই। শুধু মুখে নয়, জীবনযাত্রায় ছিল বিপ্লবী আদর্শ, শিক্ষকতা করার সময়েই শাখা-সিঁদুর পরিত্যাগ করে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। বলতেন পরাধীনতার এইসব বন্ধন থেকে মেয়েদের মুক্ত হতে হবে। ছোটখাট চেহারার ফর্সা সাদা শাড়ি পরিহিতা গীতাদি ছিলেন সদা হাস্যময়ী। যে কোনো সঙ্কটে তাঁর মুখে হাসি লেগেই থাকতো। যখনই কোথাও নির্যাতন অত্যাচারের ঘটনা ঘটত সব জায়গায় ছুটে যেতেন তিনি।

'৮০-র দশকে আই পি এফ-এ তিনি ছিলেন রাজ্য ও জাতীয় নেত্রী। সি পি আই (এম এল) প্রকাশ্যে আসার আগে পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিশীল মহিলা সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা এবং তিনি সমিতির সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সালে সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি গঠনের সময় গীতাদি সর্বভারতীয় সভানেত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটিরও সভানেত্রী ছিলেন। দীর্ঘ ১৫ বছর ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যা। নারীদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন ও বৈষম্য তাঁকে গভীরভাবে ভাবাতো। মহিলাদের সচেতন করা ও পাশে থেকে লড়াইয়ের শপথ থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন নারী আন্দোলনের নেত্রী।

'৯৪ সাল হিন্দুধর্মের ধারক পুরীর শঙ্করাচার্য যখন কলকাতার বুকে এসে নিদান দিলেন যে, মহিলা ও শূদ্রদের বেদ পাঠ বারণ, তখন গীতা দাস তাঁর সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে কলকাতায় এই বাবাজীর ঘাঁটিতে গিয়ে তার দলবল ও মিডিয়ার সামনেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বলেন এটা বামপন্থী মানুষের কলকাতা, আপনি চলে যান। আপনার ফতোয়া আমরা মানি না। যতদিন আপনি এই রাজ্যে থাকবেন আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাবো। এরপর যেখানে শঙ্করাচার্য তাঁর বাণী শোনাতে গেছেন গীতা দাস ও তাঁর সমিতির নেত্রীবৃন্দ পৌঁছে যেতেন তার বিরোধিতায়। বাধ্য হয়েই শঙ্করাচার্য এই রাজ্য থেকে পালিয়ে যান। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, বন্দীমুক্তি আন্দোলন, বানতলা, সিঙ্গুর সমস্ত ক্ষেত্রে গীতাদি ছিলেন প্রতিবাদের অগ্রণী মুখ। শুধু নিজের সংগঠন নয়, তার বাইরেও নানা বাম ও গণতান্ত্রিক নারী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সাথে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব ও সখ্যতা। মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সাথে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত স্তরের মেয়েদের উপর নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরোধিতায় যেমন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন তেমনি তাঁর লেখার মাধ্যমেও মানুষের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছেন। নারী আন্দোলনের মুখপত্র ''প্রতিবিধান''-এর তিনি ছিলেন সম্পাদিকা। প্রতিবিধানের উপদেষ্টামণ্ডলীতে মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেব সেন, মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রগতিশীল লেখিকাদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে গীতাদির ছিল মুখ্য ভূমিকা।

বয়স কখনই তাঁর সংগ্রামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁর উচ্ছ্বাস ও আবেগ ছিল যুবতীর মত। সুন্দর কথা ও বলিষ্ঠ ভাষণের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন জনপ্রিয় নেত্রী, সবার কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ও ভালবাসার মানুষ। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার গীতাদি, আপসহীন লড়াইয়ে নির্ভীক যোদ্ধা কমরেড গীতা দাস চিরকাল বামপন্থী ও নারী আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে থাকবেন। গীতাদি বেঁচে থাকবেন আগামী দিনে আমাদের সমস্ত সংগ্রামে—লড়াইয়ে ময়দানে। কমরেড গীতা দাস অমর রহে।

- মিতালী

... নিখোঁজ হায়দার ও জুলফিকর

একের পাতার পর

বীরভূম জেলা শাখার পক্ষ থেকে অশোক মণ্ডল ও এই প্রতিবেদক এবং ব্যক্তিগত আগ্রহে বিলাস সরকার নয়াগ্রামে জুলফিকরদের বাড়িতে যান। জুলফিকরের মা আরও জানান যে তাঁর এই ছেলেটি খুবই নিরীহ প্রকৃতির, মূলত গ্রামেই কাজ করত সে এবং গ্রামের গম্বুজওয়ালা মসজিদটি নির্মাণের মূল রাজমিস্ত্রি সেই। হায়দারের জ্যাঠামশাই ও আরও কয়েকজন উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। জুলফিকর ও হায়দারের বাড়ির সন্ত্রস্ত মানুষেরা ব্যাকুলভাবে বারবার বললেন যে, তাঁরা শুধু জানতে চান তাঁদের ছেলেরা এখন কোথায় আছে, কী অপরাধে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কেন লোকাল থানার মাধ্যমে তাঁদের এসব জানানো হবে না, তাঁদের ছেলেরা কি আদালতে উকিল দিতেও পারবে না?

এইসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে কিছু মানবাধিকার/রাজনৈতিক কর্মীর মাধ্যমে কাশ্মীর পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরে প্রচার চলে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি মিডিয়ার নজরে এসেছে। ইংরেজি কাগজ 'দ্য হিন্দু'-তে ২৫ অক্টোবর সংবেদনশীলভাবে প্রকাশিত হওয়ার তিনদিন পর 'আবাপ' স্টোরি করেছে। আরেকটি ইংরেজি কাগজ 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর খবর অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল কে রাজিন্দ্র জানিয়েছেন যে নিয়া-র তদন্তকারী দলের নির্দেশেই তারা যা করার করেছেন এবং ''থরো ইনভেস্টিগেশন''-এর মাধ্যমে তারা নিশ্চিত যে ''বর্ধমান ঘটনার সাথে কাশ্মীরের কোন যোগাযোগ নেই'' এবং কাউকেই তারা 'গ্রেপ্তার' করেননি, দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য 'ডিটেইন' করা হয়েছিল মাত্র, প্রমাণ না পেয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধির ফোনের জবাবেও বারবার ডিজি একই কথা বলেন এবং যেহেতু ঐ যুবকদের বাড়ির ঠিকানা তারা নিশ্চিতভাবে জেনেছেন তাই ছেড়ে দেওয়ার পর আর তাঁদের সন্ধান রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। ২৪ অক্টোবর সর্বশেষ কে রাজিন্দ্র জানিয়েছেন যে

পাঁচের পাতায় দেখুন

প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সুব্রমনিয়ন কার স্বার্থ রক্ষা করবেন—ভারতের না আমেরিকার?

।। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।।

‘‘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের ভারতে তিনটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সমস্ত বিদেশী সংস্থাকেই মুখোমুখি হতে হয় এমন দুটি সাধারণ চ্যালেঞ্জ হল ঃ প্রথমত, দুর্বল নিয়ন্ত্রণমূলক ও অনিশ্চিত কর পরিমন্ডল, যা অসামরিক পারমাণবিক শিল্প, পরিকাঠামো নির্মাণকারী ও ওষুধ প্রস্তুতকারক এবং আরও সাধারণভাবে বললে ভারতে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির কর্মকান্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির উপরিস্তরের ছবিটা যদিও অর্থনীতিকে আরও উন্মুক্ত করা এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্রমবিস্তারকেই দেখিয়ে দেয়, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। ভারত ক্রমে আরও বেশী করে স্থানীয়করণের পথেই যাচ্ছে—ব্যাঙ্ক, টেলিযোগাযোগ, খুচরো ব্যবসা এবং সৌর প্যানেল যার কিছু দৃষ্টান্ত—যা কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিদেশী সরবরাহকারীদের তুলনায় ভারতীয় সরবরাহকারীদেরই সুবিধা দিয়ে থাকে। অতএব, বিদেশীদের সাপেক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত অর্থনীতির উপরিস্তরের নীতিগুলি সঠিক অভিমুখেই এগোচ্ছে, কিন্তু ক্ষেত্রভিত্তিক নীতি ধাক্কা খেয়েছে।’’

উপরের উক্তিটি কার হতে পারে? মার্কিনের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত কোন বিশেষজ্ঞের? অথবা, উৎপাদন ব্যবস্থার স্থানীয়করণ ঘটানোর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পনার বিদেশী কোন সমালোচকের?

এর উত্তর হল, ঐ উক্তি এদের কারোরই নয়, তা হল বর্তমান প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রমনিয়নের।

এটা দীর্ঘদিন আগে হঠাৎ দেওয়া তাঁর কোন বিবৃতি নয়। ঐ উদ্বিতিটি নেওয়া হয়েছে ‘‘মার্কিন কংগ্রেসের ওয়েজ এন্ড মিনস্ কমিটি’’র কাছে দেওয়া তাঁর বিবৃতি থেকে, যে কমিটি ২০১৩ সালের মার্চ মাসে ‘‘ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক’’ বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছিল।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পিটারসন ইনস্টিউট এবং বিশ্ব উন্নয়ন কেন্দ্রর বরিষ্ঠ সভ্য হিসেবে তিনি স্পষ্টতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে, ভারতের সঙ্গে কিভাবে ব্যবসা করতে হবে। এই বিবৃতির ঢঙ ও মর্মার্থ এক মার্কিন বাণিজ্য বিশেষজ্ঞের যিনি তাঁর দেশের স্বার্থের সুরক্ষায় উদগ্রীব।

উপরের উদ্বৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের দুর্বলতা বলে যেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু বিষয় আসলে ভারতের শক্তি যা ভারতীয় জনগণের স্বার্থকে সুরক্ষিত করে— অসামরিক পারমাণবিক শিল্প ও ওষুধ প্রস্তুতকারক এবং বিদেশী বহুজাতিক শক্তিগুলির কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণমূলক ও কর ব্যবস্থা। এর সাথে তিনি ‘‘সংরক্ষণবাদ’’ এবং ‘‘স্থানীয়করণের পথে যাওয়া’’র কথা উল্লেখ করেছেন যা বিদেশী সরবরাহকারীদের তুলনায় ভারতীয় সরবরাহকারীদের সুবিধা দিয়ে থাকে এবং যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে।

ওষুধ তৈরী সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা ওষুধ তৈরীর বহুজাতিক সংস্থাগুলি ও মার্কিন বাণিজ্য মঞ্চগুলির বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়, যারা সর্বদাই ওষুধ তৈরী সম্পর্কে ভারতের নীতির সমালোচনা করে, যে নীতি ভারতের দেশীয় আইন ও পরিস্থিতি (মূল্য নির্ধারণ ও পেটেন্ট) এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (বাণিজ্যে বিনিয়োগ সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব বিষয়ে নমনীয়তা) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিছুদিন আগে, বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে ওষুধ তৈরী সম্পর্কিত ভারতের প্রচলিত মেধাস্বত্ব ব্যবস্থার উপর একটা আক্রমণ নামানো হয়। ভারতকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়। ওষুধ তৈরী সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণমূলক ও কর ব্যবস্থাকে ‘‘দুর্বল ও অনিশ্চিত’’ বলে অরবিন্দ সুব্রমনিয়ন ভারতের স্বার্থকে তুলে ধরতে অস্বীকার করেছিলেন। সরকার সম্প্রতি ওষুধের মূল্য নির্ধারণের জাতীয় কর্তৃপক্ষের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তুলে নেওয়ার পর ওষুধের দাম বেড়ে চলেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। সম্ভবত চাপের মুখে পড়ে সরকার এখনও পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে দূরে রয়েছে।

আমেরিকার ওষুধ তৈরীর গবেষণা ও উৎপাদনকারীদের সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট রড হান্টার হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কি বলেছেন দেখা যাক ঃ ‘‘ভারতে মেধানিবীড় শিল্পগুলিতে বিনিয়োগের পথে একটি বড় বাধা হল মেধাস্বত্ব। মেধাস্বত্ব সুরক্ষার ব্যাপারে ভারত বৈরিতা দেখিয়ে আসছে, বিশেষভাবে ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত স্থানীয় ওস্তাদদের সুবিধা করে দিতে ভারতে লভ্য উদ্ভাবনমূলক ওষুধগুলির ক্ষেত্রে পেটেন্টকে হয় যথেষ্ট মাত্রায় অকার্যকর করে তুলেছে, আর না হয় অন্য পথে তার উপর হানাদারি চালিয়েছে।’’

মার্কিন কংগ্রেসের কাছে দেওয়া উপরে উল্লিখিত তাঁর বিবৃতিতে অরবিন্দ সুব্রমনিয়ন আরও বলেছেন, ‘‘ আমেরিকার কোম্পানীগুলিকে ভারতের বৃহৎ ও ক্রমবর্ধমান বাজারে ক্রমেই আরও বেশী করে বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এই কারণে যে, ভারত তার বৃহত্তম বাণিজ্য শরিকদের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য বা অংশীদারিত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে (বা করতে চলেছে) যারা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ ইউরোপ, জাপান, সিঙ্গাপুর, আসিয়ান এবং সম্ভবতঃ আসিয়ানের সাথে আরও ছয়টি দেশ। এই বৈষম্য যদি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বড় আকারের হয়ে না থাকে তবে তা শীঘ্রই মার্কিন ব্যবসায়ীদের কাছে সম্প্রতি নেওয়া কিছু ক্ষেত্রগত পদক্ষেপের চাইতে আরও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হওয়া অবাধ বাণিজ্য চুক্তিগুলির পরিধি যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বিস্তৃত, এই আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলির ব্যাপকতা ততটা নয়, আবার সেগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে সময়সীমাও তেমন আশু নয়। কিন্তু সেগুলি অ-মার্কিন সরবরাহকারীদের ঢোকার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা দেয় এবং ভারতের শুল্ক ও শুল্কপ্রাচীর যেহেতু উঁচু হারের হতে পারে, ঐ বৈষম্য তাই যথেষ্ট মাত্রার হয়ে উঠতে পারে। এর সঙ্গে ভারতের বৃহৎ ক্রমবর্ধমান বাজারের বিষয়টি যুক্ত হয়ে মার্কিন সরবরাহকারীদের কাছে যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।’’

এখানেও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কগুলিকে আলাদাভাবে বেছে নিচ্ছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হওয়া অবাধ বাণিজ্য চুক্তিগুলির উপর জোর দিচ্ছেন। ভারতে এবং অন্যান্য দেশের উন্নয়ন ধারার অর্থনীতিবিদ্ ও আন্দোলনের কর্মীরা অবাধ বাণিজ্যের চুক্তিগুলিকে, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে হওয়া চুক্তিগুলিকে যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখেন, কেননা সেগুলি সহজাতভাবেই জনগণের বৃহত্তর স্বর্থের পক্ষে ক্ষতিকর। রাষ্ট্রসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্পর্কিত সংস্থার সর্বশেষ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্পর্কে রিপোর্টে (২০১৪) বলা হয়েছে যে, অবাধ বাণিজ্যের চুক্তিগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির নীতি সংক্রান্ত পরিসরকে সংকুচিত করে তোলে। কয়েক বছর আগে থাইল্যান্ডে মার্কিনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত ব্যাপক বিক্ষোভ-প্রতিবাদ এর একটা দৃষ্টান্ত।

তাঁর পূর্ববর্তী অবতারে মার্কিনের প্রতি বর্তমান অর্থনৈতিক উপদেষ্টার সবচেয়ে মোক্ষম পরামর্শটা ছিল এইরকম ঃ

বাণিজ্য সংঘাতের নিস্পত্তি এবং অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে সবচেয়ে বেশী মাত্রায় কার্যকরি করে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় নীতিগুলি প্রশ্নাতীতভাবে সংরক্ষণমূলক (যথা, বহু স্থানীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত নীতি), সেইসমস্ত ক্ষেত্রে বিবাদগুলিকে বহুপাক্ষিক সংস্থার (বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা) বিবাদ নিস্পত্তিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা। এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন মুখবুজে না থাকে।’’

যে প্রশ্নটা এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে তা হল, এই প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কার স্বার্থ রক্ষা করবেন? ভারতের না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের? দোষটা তাঁর নয়, বরং ভারতের। তিনি হলেন চূড়ান্তরূপে সঞ্চরণশীল বহুজাতিক পুঁজির বহু পেশাদার মুখের অন্যতম। আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের কৌলিন্য ব্যাপক সংখ্যাধিক হতদরিদ্র ভারতবাসীর স্বার্থ সাধারণভাবে রক্ষা করে না। ‘‘ভারতে নির্মাণ করুন’’-এর নীতি এদেশে বেড়ে ওঠা বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার সময় সমুপস্থিত।

... হায়দার ও জুলফিকর

চারের পাতার পর

তিনদিনের মধ্যে নিখোঁজ দুই যুবকের সন্ধান না পেলে তাঁর সাথে আবার যোগাযোগ করা হয়।

‘হারিয়ে যাওয়া’ অনেক যুবক অনেক পরে ‘এনকাউন্টারে নিহত সন্ত্রাসবাদী’ হিসাবে অথবা ‘সন্ত্রাসবাদী বন্দী’ হিসাবে পুনরায় ফিরে আসে! এই ক্ষেত্রেও খটকা লাগে যখন দেখা যায় যে কাশ্মীর পুলিশ জুলফিকরদের ঠিক কবে ছেড়ে দিয়েছিল তা নির্দিষ্টভাবে জানায়নি এবং নেট ঘেঁটে দেখা যায় যে ১২ অক্টোবর এই ঘটনাটিই ধৃতদের নাম না করে রিপোর্টেড হয়েছিল যেখানে ‘আই এস আই এস’-কে টেনে এনে ‘কাশ্মীর’কে জুড়ে ‘বৃহৎ গেমপ্ল্যান’-এর গল্প দেওয়া হয়েছিল! এখন কি করবে জুলফিকর ও হায়দার-এর পরিবার পরিজন? আমরাই বা কি করব?

- মলয় তেওয়ারী

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে ৪ লাইনে পড়তে হবে ‘‘...জনগণের সেবার স্বর্থে **যে**-কোনক্ষেত্রেই...’’। ১২ লাইনে পড়তে হবে ‘‘... ফলশ্রুতির কারণ সম্পূর্ণ **অন্য**।’’ ‘হালদারদীঘির ধর্মঘট’ রিপোর্টের লেখক ছিলেন **মুকুল কুমার ও ইউসুফ মন্ডল।**

‘হোক কলরব’ সমর্থনে রাণুছায়া মঞ্চে প্রতিবাদী আয়োজন

আপাতভাবে মনে হতেই পারে ‘হোক কলরব’ স্তিমিত হয়ে গেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ‘‘স্থায়ী’’ হয়ে গিয়েছেন। ক্যাম্পাস তথা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গণতন্ত্রের দাবিতে উদ্বেল আন্দোলন মাথা ঝুঁকিয়েছে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতার অসাধু যোগসাজশের কাছে। কিন্তু যাঁরা তা ভাবছেন তাদের ভাবনা যে ভুল তা টের পাওয়া যাচ্ছে প্রতিদিন বিভিন্ন রূপে চলতে থাকা ‘হোক কলরব’-এর কোলাহলে। আজ যাদবপুরে, কাল কলেজ স্ট্রীটে তো পরশু একাডেমি চত্বরে লেগেই রয়েছে প্রতিবাদী কণ্ঠের যূথবদ্ধ আওয়াজ। তেমনই এক প্রতিবাদী আয়োজন হয়েছিল ২৭ অক্টোবর ২০১৪ কলকাতায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে রাণুছায়া মঞ্চে। অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি, কলকাতা নাগরিক সমন্বয় ও পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের যৌথ উদ্যোগে যাদবপুরে ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে ও রাজ্যজুড়ে গণতন্ত্রের উপরে হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন ছাত্র-যুব-মহিলা সমেত বিশিষ্টজনেরা। প্রতিবাদ উঠল গানে কবিতায় বক্তৃতায় শ্লোগানে। কবি সব্যসাচী দেব, সাহিত্যিক কিন্নর রায়, গায়ক রঞ্জন প্রসাদ, অধ্যাপক সলিল বিশ্বাস প্রমুখেরা কথায় ও গানে অনুভুত হল ‘হোক কলরব’-এর বহমানতা।

অনুষ্ঠান মঞ্চে গণশিল্পী নীতীশ রায়।

আয়োজকদের পক্ষে গান গাইলেন আকাশ-অরুমিতা, রাকা, জ্যোতি, প্রণব, বাবুনি, নীতীশ; শ্রুতি নাটক করলেন মিতালী ও অন্যান্যরা; ডাক্তার দেবাশীষ, চন্দ্রাস্মিতারা জানিয়ে দিলেন লড়াই জারি রয়েছে, যাদবপুরের ভিসি-র পদত্যাগের দাবিতে, রাজ্যের সমস্ত ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রের দাবিতে এবং রাজ্যজুড়ে গণতন্ত্রহীনতার বিরুদ্ধে; কেবল তাই নয় সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িক আস্ফালন ও দাঙ্গার নাকাড়া বাজতে শুরু করেছে তার বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলেন উপস্থিত সকলেই। সমগ্র অনুষ্ঠান সমন্বিত করেন গণশিল্পী নীতীশ রায়।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত ইংরাজী সাপ্তাহিক ‘‘আপডেট’’ গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

সারদা কেলেঙ্কারি ঃ লুঠ হওয়া টাকা উদ্ধার করে আমানতকারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক

সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে সি বি আই তদন্তের অভিমুখ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও, শ্যামল সেন কমিশন যে মাঝপথেই সমাপ্ত হতে চলেছে তা আগে থাকতেই বোঝা যাচ্ছিল এবং বাস্তবে তাই হয়েছে। এখন শ্যামল সেন কমিশনের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়েছে, আর সরকারেরও প্রয়োজন নেই যে সময়সীমা বাড়িয়ে কমিশনের কাজকে চালিয়ে যাওয়া। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্যামল সেনকে প্রধান করে এই কমিশন তৈরী হয়। তার আগেই সারদা কেলেঙ্কারি সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ আমানতকারীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন, অনেকে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। অনেক বঞ্চিত আমানতকারী হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে আত্মহত্যা করেন। লুঠের টাকা ফেরত ও অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে গণতান্ত্রিক জনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেন সি বি আই-এর উদ্দেশ্যে ১৮ পাতার একটা চিঠি পোস্ট করে পালিয়ে যায়। এখন সকলেই জেনে গেছেন যে, তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সুদীপ্ত সেন পালায়। ক্ষোভে ফেটে পড়া আমানতকারীদের প্রতি মমতা উপদেশ দিয়েছিলেন যে, 'যা গেছে তা গেছে'। এতে তো জনমত প্রশমিত হওয়ার নয়। ইতিমধ্যেই এই বিরাটমাত্রার কেলেঙ্কারি নিয়ে ই ডি ময়দানে নেমে পড়ে, সি বি আই তদন্তের দাবি ওঠে ও এই বিষয়ে আলোচনাও শুরু হয়ে যায়। এ সমস্ত আটকাবার চেষ্টাতেই সারদা কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করা হয়, কুনাল ঘোষকে বলির পাঁঠা করা হয় এবং শ্যামল সেন কমিশন তৈরী করা হয়। সর্বোপরি এক বছরের মাথাতেই ছিল লোকসভা নির্বাচন। তাই সারদা কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে নিয়ে ৫০০ কোটি টাকার এক তহবিল তৈরীর কথাও মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেন। গণতান্ত্রিক জনগণের দাবি ছিল লুঠ হওয়া টাকা উদ্ধার করা হোক এবং সারদার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ও তা বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু সে রাস্তায় মমতা হাঁটতেই চাননি এবং এমনকি, লুঠ হওয়া টাকা কোথায় গেল তা নিয়ে কোন ধরণের তদন্তই করতেই চান না। শ্যামল সেন কমিশনের অন্যতম এক কাজ ছিল এই লুঠের পেছনে মূল মূল যে ব্যক্তিরা আছে তাদের চিহ্নিত করা। কিন্তু এটা ছিল নিছকই নামকাওয়াস্তে। বাস্তবে কমিশনের মূল কাজ ছিল ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরী করে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। এর জন্য সরকারি কোষাগারের টাকা কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কমিশন যে ৪০৪ পাতার একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠায় তাতে কেলেঙ্কারির নায়কদের চিহ্নিত করা গেছে কিনা তা জানা নেই, সংবাদ মাধ্যমেও তার কোন সংবাদ প্রকাশ হয়নি। এখন তো আরও বড় কথা হল যে এই রিপোর্ট এক বেওয়ারিশ রিপোর্ট হয়ে গেছে। রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে কমিশনের বিলুপ্তি ঘটে গেছে, আর সরকার এই রিপোর্ট নিজের ঘরেই তোলেনি, কেননা রিপোর্টে শুধু কমিশন প্রধান শ্যামল সেনের সই আছে, কমিশনের অন্য দুই সদস্যের সই নেই। অভিযোগ আছে যে, অপর দুই সদস্যেরই কমিশনের অফিসে যাওয়া বন্ধ ছিল এবং তা ছিল তৃণমূলনেত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী। শ্যামল সেন কমিশনের পর্ব সম্ভবত এখানেই শেষ।

মমতা সরকার ও তার মন্ত্রীরা বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময়কালে প্রচার করেছে যে কমিশনকে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এ যাবত ৫ লক্ষ আমানতকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবটাও ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সরকার কমিশনের তহবিলে দিয়েছে ৫০০ কোটির বদলে ২৮৬ কোটি টাকা, এরমধ্যে ২৫১ কোটি টাকার চেক বিতরণ হয়েছে, কমিশনের হাতে রয়ে গেছে ৩৫ কোটি টাকা। আবার ২৫১ কোটি টাকার যে চেক ইস্যু হয়েছে তার মধ্যে ১০২ কোটি টাকার চেক ফিরে এসেছে, কেননা তার সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল। চেক ভাঙ্গাতে পারা গেছে মোট ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৮২টি। অনেকেই আছেন যাঁরা একাধিক অ্যাকাউন্টে আমানত করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী এক ব্যক্তি একাধিক চেক পেয়েছেন। অর্থাৎ প্রাপকদের সংখ্যা ৫ লক্ষ নয়, তার থেকে বেশ কম। ইতিমধ্যে কমিশন সারদার পাওনা কিছু বকেয়া বাবদ ২.৩৯ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সরকারের ঘরে ফিরে গেছে ১৪০ কোটি টাকা। এখন আমানতকারী ও গণতান্ত্রিক জনমত শ্যামল সেন কমিশনের মেয়াদ বাড়াবার দাবি তুলেছে। আমানতকারীরা হাইকোর্টে গেছে। হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে যে এটা সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, কমিশনারের মেয়াদ বাড়ানো হবে কি হবে না তার সিদ্ধান্ত সরকারই নিতে পারবে। মমতা সরকার ইচ্ছে করলে এটা করতে পারত এবং সারদার সম্পত্তি উদ্ধার করা ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য আলোচনা ও সহযোগিতা চালাতে পারত। কিন্তু মমতা তা করবেই না, কেননা এদিকে এগোলে তৃণমূল কংগ্রেস নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবে।

তাই রাজ্য সরকারের কাছে লুঠের টাকা ফেরতের দাবি আরও জোরদার হয়ে উঠবে, জোরদার হয়ে উঠবে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবি।

- কল্যাণ গোস্বামী

শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য ও সম্প্রীতি সুদৃঢ় করুন
বিজেপি-আর এস এস-এর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন

প্রিয় রাজ্যবাসী,

সে কী হৈ চৈ। সুদিন এলো বলে। টিভিতে-খবর বিক্রির-বিজ্ঞাপন শুধু একটাই কথা। নরেন্দ্র মোদী আসছে, এবার সুদিন এলো বলে। খাদ্যদ্রব্য সহ সমস্ত জিনিসপত্রের দাম কমবে, বেকারদের চাকরি হবে, কালো টাকা উদ্ধার করে দেশবাসীর প্রত্যেকের নামে ব্যাঙ্কে ১৫ লক্ষ টাকা জমা পড়বে, দুর্নীতি প্রায় দূর হয়ে যাবে। আসমুদ্র হিমাচল জনসভা করে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ এবং আর এস এস সরসংঘচালক মোহন ভাগবত এই কল্পকথা প্রচার করেছিল, আর তলায় তলায় কর্পোরেট পুঁজিপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেছিল, তোমাদের লুঠ-পাটে কোনো বিঘ্ন হবে না, বরং জল-জমি-জঙ্গল ও প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রাস করতে নমো ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সহায়তা-ই করবে। বিদেশ থেকে এফ ডি আই আসবে, আমেরিকার সাথে দোস্তি হবে। ব্যবসা আরও ফুলে-ফেঁপে উঠবে। অথচ গ্রাম-শহরের কর্মহীন মানুষের ১০০ দিনের কাজ সংকুচিত করতে এদের কোনো দ্বিধা হয় না।

৫ মাস যেতে না যেতেই সুদিনের গল্প শেষ! এখন বলছে বিদেশ থেকে, সুইস ব্যাঙ্ক থেকে এক টাকাও উদ্ধার করা যাবে না। ওসব ভোটের সময় বলতে হয়, ভোট পাওয়ার জন্য বলতে হয়, ভোট মিটে গেলে ভুলে যেতে হয়। এখন তাই নতুন কথা—স্বচ্ছ ভারত গড়ো। এ্যাডলফ হিটলারের ক্লিনজিং অপারেশনের ভারতীয় সংস্করণ। মোদী থেকে শুরু করে সংঘ পরিবারের চ্যালা-চামুণ্ডারা ঝাঁটা হাতে স্বচ্ছ ভারত গড়ার কাজে নেমে পড়েছে। সেলিব্রিটিরা সবাই এখন ঝাড়ু হাতে এই অভিযানে নেমেছে। কেউ যদি ভুল করে জিজ্ঞাসা করে বস্তিগুলোর নর্দমা পরিষ্কার কবে হবে, গরিব শ্রমজীবী জনগণের ভাঙাচোরা বাড়িগুলো কবে সংস্কার হবে, যারা খোলা আকাশের নীচে বউ-বাচ্চা নিয়ে দিন কাটায় তাদের একটা মাথাগোঁজার ঠাঁই আর দু-মুঠো ভাতের ব্যবস্থা কবে হবে—তাহলেই হল। নিশ্চয়ই আপনি বা আপনারা দেশদ্রোহী! শিলাদিত্যের কথা মনে নেই? সার-বীজের দাম কবে কমবে একথা জিজ্ঞাসা করায় ওর হাজতবাস হয়েছিল। ভুলে গেলেন? এখন চলছে স্বচ্ছ ভারত গড়ার অভিযান!!

ন্যাংটার তো বাটপাড়ের ভয় থাকে না। দেউলিয়া নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা ঘুরে এলেন। যাওয়ার আগে জীবনদায়ী ওষুধের দাম কয়েক লক্ষ টাকা বাড়িয়ে গেলেন। ওখানে বলে আসলেন তোমরা বড় বড় পুঁজিপতিরা ভারতে এসো। ব্যাঙ্ক-বীমা-প্রতিরক্ষা-রেলে তোমরা পুঁজি ঢালো এফ ডি আই এসো, এফ ডি আই। আজকের যুগে বিদেশ বলে কোনও কথা আছে নাকি—গোটা পৃথিবীটাই আমেরিকার পুঁজিপতিদের ভাষায় গ্লোবাল ভিলেজ। ১৯০ বছরের ব্রিটিশ পরাধীনতার পর এবার মোদীর নেতৃত্বে মার্কিন দাসত্বের পালা শুরু হল বলে—সংঘ পরিবারের মীরজাফররা উঠে-পড়ে লেগেছে। এই দাসত্বের নতুন নাম—মেক ইন ইণ্ডিয়া। এসো ভোগ কর, লুঠ কর এবং ভারত গড়ো! আমেরিকান পুঁজিপতিদের কাছে ভাষণে নরেন্দ্র মোদী একথাই বলে এসেছেন।

পাঁচ মাস যেতে না যেতেই রাজা উলঙ্গ। কিন্তু সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। শুরু হয়েছে ইসলামো ফোবিয়া (মুসলিম ভীতি-বৈরিতা)। কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিল ১৯৯১ সালে গ্রেট ব্রিটেনের একটি সংস্থা—রুনিমেড ট্রাস্ট। মুসলিম ভীতি-বৈরিতা তৈরির কাজে এরপর গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সব সরকার নেমে পড়ল। খাগড়াগড় বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে এই মুসলিম ভীতি-বৈরিতা ও বিদ্বেষ তৈরির কাজে নেমে পড়েছে সংঘ পরিবার, বিজেপি এবং আর এস এস-এর সেবকরা। একাজে 'যোগ্য' সংগত দিচ্ছে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলো। কে কত 'নিখুঁত তথ্য' দিতে পারে তা নিয়ে ওদের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। যারা সবার চোখের সামনে বাবরি মসজিদ ভাঙালো, দেশজুড়ে দাঙ্গা বাধালো, ২০০২ সালে গুজরাট জুড়ে মুসলিম গণহত্যা সংগঠিত করল, লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে আবার দ্বিখণ্ডিত করার লাগাতার চেষ্টা চালাচ্ছে, তারা হঠাৎ দেশপ্রেমিক সাজার চেষ্টা চালাচ্ছে। যাদের মুখপত্র (সংঘ পরিবারের মুখপত্র কেশরীতে) প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, গান্ধীকে না মেরে নাথুরাম গডসের উচিত ছিল জওহরলাল নেহরুকে হত্যা করা। এরা নাকি শান্তিপ্রিয় দেশভক্ত, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক! এরাই খাপ পঞ্চায়েতের মাতব্বর মনোহরলাল খাট্টারকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বানায়। বাবু, এদের দেশপ্রেম নিয়ে জোর কইয়েন না, ঘুড়ায় হাসব!

৬৬ বছর ধরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়েও এই বাংলায় বিজেপির কোন ঠাঁই হয়নি। কিন্তু রাজ্যজুড়ে তৃণমূলী সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য, পরিবর্তনের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা, চরম দলতন্ত্র, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধে মানুষ বীতশ্রদ্ধ, বিক্ষুব্ধ। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। যে কোনও ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়ে পায়ের তলায় জমি খুঁজতে চাইছে। লজ্জা ও ধিক্কারের বিষয়, কোনও কোনও 'বামপন্থী' দল ওদের প্রচারে গা ভাসিয়েছে। এমন সব বিবৃতি ও বয়ান দিচ্ছে যা সংঘ পরিবারের প্রচারকেই পুষ্ট করছে। বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বোমা বিস্ফোরণ হল, তিন জন মারা গেল, কয়েক জন আহত হল। এরকম বোমা বিস্ফোরণ ও মৃত্যু এরাজ্যে আকছার হচ্ছে, দিন দিন আরও বাড়ছে। যে কোনও শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক মানুষ এর তীব্র নিন্দা করবে। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করবে। কেননা পুলিশ-প্রশাসনের তদন্তে মানুষের আস্থা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তদন্ত ও বিচারে যে বা যারাই দোষী প্রমাণিত হবে, তারা যে ধর্মেরই লোক হোক না কেন, সেই অপরাধীদের শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু বিচারবিভাগীয় তদন্তে বিজেপি খুশি নয়। তাতে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলা যাবে না, মুসলিম জনগণকে আতঙ্কগ্রস্ত করা যাবে না, মাদ্রাসাগুলোকে টার্গেট বানানো যাবে না। তাই মোদী নিয়ন্ত্রিত (নিয়া) এন আই এ এবং এন এস জি-র তদন্ত শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করে ২০১৫-এর পৌর নির্বাচনে ও ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করা। এই সংকীর্ণ স্বার্থ মেটাতেই সংখ্যালঘু জনগণকে হয়রানি করা, আতঙ্কগ্রস্ত করা। শুরু হবে নিরীহ মুসলিম যুবকদের ওপর নজরদারি ও গ্রেপ্তারি।

যে কোনও মূল্যে আর এস এস-বিজেপির এই উৎপাত ও উন্মাদের রাজনীতিকে প্রতিরোধ করতে হবে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরোধিতা করতে হবে। শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য ও সম্প্রীতিকে রক্ষা করতে হবে। শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের বেঁচে থাকার দাবিগুলো নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস কারোরই মাথাব্যথা নেই। বামপন্থীদের জনগণের গণতন্ত্র ও অধিকারের এই লড়াইকে জোরদার করতে হবে। এ বাংলাকে রক্তাক্ত করার সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে।

- **রুটি-রুজি-গণতন্ত্রের লড়াইকে শক্তিশালী করেই বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করুন।**
- **কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি ও সন্ত্রাসের রাজনীতিকে প্রতিহত করুন।**
- **সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণের গণতন্ত্র ও জীবন-জীবিকার ওপর হামলা প্রতিরোধ করুন।**
- **সন্ত্রাস ও দাঙ্গার রাজনীতিকে পরাস্ত করুন।**

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ

সি পি আই (এম এল)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ফিরে দেখা ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে হিন্দুত্ববাদীদের স্বরূপ

‘বীর’ সাভারকর, সঙ্ঘ পরিবার ঃ কিছু তথ্য, কিছু কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিপ্লবী বীর সাভারকার

বিনায়ক দামোদর সাভারকার (ভি ডি সাভারকার হিসেবেই সমধিক পরিচিত)-এর জন্ম মে ২৮, ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাই-এর নাসিক শহরের সন্নিকটে ভাগুর নামক একটি গ্রামে। পিতা দামোদর পন্ত ও মাতা রাধাবাঈ। সাভারকাররা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ গণেশ দামোদর সাভারকার, মধ্যম বিনায়ক দামোদর সাভারকার এবং কনিষ্ঠ নারায়ণরাও সাভারকার।

সাভারকার-ভাইয়েরা সকলেই একটা সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিনায়ক দামোদর সাভারকর নাসিকে নিষ্ঠাবান কর্মীদের নিয়ে একটি প্রভাবশালী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠনটি ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে মিত্রমেলা নামে আখ্যাত হয়। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এই আখ্যালাভ করলেও এর উন্মেষ ঘটে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে। সাভারকার-ভাইয়েরা সকলই এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে দেশের স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নে মশগুল বিনায়ক দামোদর সাভারকার এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভাই সহ অন্যান্য কর্মীরা সচেতনভাবেই গোপন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে এই মিত্রমেলা ‘অভিনব ভারত সঙ্ঘ’ নামে পরিচিতি পায়।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিনায়ক বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর জুন ৯, ১৯০৬ তারিখে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার লক্ষ্যে লণ্ডন যান এবং সেখানে ‘গ্রে’জ ইনস্’-এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি ‘অভিনব ভারত সঙ্ঘ’-এর শাখা স্থাপন করেন এবং ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে মুক্তি সংগ্রামে সংগঠিত করার কাজে ব্রতী হন। তাঁর এই সংগঠনের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হন ভাই পরমানন্দ, ভি ভি এস আয়ার, হরনাম সিং, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাদাম কামা প্রমুখ বিপ্লবীরা।

১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডনে শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মা ‘ইণ্ডিয়া হাউস’ নামীয় ভারতীয় ছাত্রদের একটি সম্মিলন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে এই ইণ্ডিয়া হাউস বিনায়ক দামোদর সাভারকারের কর্তৃত্বে আসে। ভারতের নাসিকে, পুনায়, বোম্বাই শহরে বিনায়ক যে প্রক্রিয়ায় অতি সহজেই অসংখ্য যুবকের সমাবেশে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, লণ্ডনেও ভারতীয় ছাত্র-যুবদের নিয়ে তিনি তাঁর সংগঠনের ভিত্তি মজবুত করে গড়ে তুলেছিলেন।

ভারতের নাসিক ও পুনায় ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদলের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন বিনায়কের জ্যেষ্ঠভাতা গণেশ দামাদর সাভরকার। নাসিক রাজদ্রোহ এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধোদ্যমে সহায়তা করার’ অপরাধে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। এই খবরে লণ্ডনে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের নিকট যথাসময়েই পৌঁছে যায়। তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হন। গণেশ দামোদরের শাস্তির আদেশ হয় জুন ৯, ১৯০৯ তারিখে। এর মাত্র বাইশ দিনের মাথায় জুলাই ১, ১৯০৯ তারিখে লণ্ডন শহরে ‘ইণ্ডিয়া অফিস ব্যুরোক্রাট’ স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলিকে মদনলাল ধিংড়া গুলি করে হত্যা করেন। মদনলাল ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসির আগে তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, যে বিবৃতিটি ‘ডেইলি নিউজ’ পত্রিকার আগস্ট ১৬, ১৯০৯ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে মদনলাল বলেছিলেন ঃ আমি স্বীকার করি, সেদিন, দেশপ্রেমিক ভারতীয় যুবকদের অমানবিক ফাঁসী দেওয়া ও দ্বীপান্তর করার বদলাটুকু নিতেই ব্রিটিশের রক্ত ঝরানোর চেষ্টা করেছিলাম। ...

এখানে বিনায়ক দামোদরের জ্যেষ্ঠভাতা গণেশ সাভারকারের ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক দ্বীপান্তরের আদেশের রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদের ইঙ্গিত স্পষ্ট। এর আগে তিনি বঙ্গ বিভাগের প্রবক্তা লর্ড কার্জনকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এই ব্যর্থতার কথা বলতে সাভারকারের নিকট ছুটে গিয়েছিলেন। এদিকে গণেশ সাভারকারকে দায়রায় সোপর্দ করেছিলেন নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন। লণ্ডন থেকে বিনায়ক সাভারকারের পাঠানো ব্রাউনিং পিস্তলের গুলিতে জনৈক বিপ্লবী ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তারিখে জ্যাকসন নিহত হন। এই বিপ্লবীর নাম অনন্ত কানহেরে।

এই সংবাদ বিনায়ক সাভারকারের নিকট পৌঁছালে তিনি উৎফুল্লচিত্ত হন এবং স্বদেশে ফিরে এসে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও তীব্র করার সংকল্প গ্রহণ করেন। মার্চ, ১২, ১৯১০ তারিখে বিনায়ক দামোদর সাভারকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে পরের দিনই লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গ্রেপ্তার হন। বিচারের উদ্দেশ্যে তাঁকে ভারত নিয়ে আসার আদেশ দেন ম্যাজিস্ট্রেট। যথাসময়েই তাঁকে বোম্বাই নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘ আটত্রিশ দিন বিচার চলার পর ডিসেম্বর ২৩, ১৯১০ তারিখে বিচারের রায় ঘোষিত হয় ঃ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও ‘সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত’।

সাভারকরের রাজদর্শন ও আদবানি অ্যাণ্ড কোং

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সুযোগ্য সহযোগী বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ আমার মতো একজন হতভাগ্য সন্তান আর কিছু না পারুক দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তাঁর বেদিতে রক্তদান করতে সদাপ্রস্তুত; আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি বারবার এই দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জন্ম নেব এবং আমার পবিত্র কর্ম সমাধান করবো।

কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করার পর রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ধিংড়া বলেছিলেন ঃ টেরোরাইজ দি অফিসিয়ালস, ইংলিস অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান, অ্যাণ্ড দি কোলাপস অফ দি হোল মেসিনারি অফ অপ্রেশন ইজ নট ভেরি ফার ... দিস ক্যাম্পেইন অফ সেপারেট অ্যাসাসিনেশন ইজ দি বেস্ট কনসিভেবল মেথড অফ প্যারালাইজিং দি ব্যুরোক্রেসি অ্যাণ্ড অফ এরাউজিং দি পিপলস্।

এ বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে দামোদর বিনায়ক সাভারকরের-ও। এ বক্তব্য তাঁর ও তাঁদের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠনের। দেশ থেকে বিদেশি ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের লক্ষ্যে তাঁরা এই পথই বেছে নিয়েছিলেন।

‘১৮৫৭-র স্বাধীনতা সংগ্রাম’ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সাভারকর (বিনায়ক) যা লিখেছিলেন তা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি তৎকালীন বিপ্লবী সাভারকরের দৃষ্টিভঙ্গী বোঝার জন্য ঃ জাতিকে তার নিজের ইতিহাসের প্রভু হতে হবে দাস নয় ...। শিবাজীর সময় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব ন্যায়সঙ্গত ছিল—কিন্তু, এখন এইরকম মনোভাব পোষণ করলে তা অন্যায় ও বোকামি হবে ...।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সাভারকর লিখেছিলেন যে, এই বিদ্রোহের পরিকল্পনার সঙ্গে গঠনমূলক অংশ সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেনি; ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণের সামনে এই বিদ্রোহের লক্ষ্য ও আদর্শকে সুস্পষ্টভাবে পেশ করতে পারলে এই বিদ্রোহ তার প্রাথমিক সাফল্যকে ধরে রাখতে ও তাকে বিস্তৃত করতে পারতো। স্মরণ রাখতে হবে, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী হিসেবে সাভারকর একথা বলেছিলেন ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ব্রিটিশবিরোধী অবস্থানের নিরিখেই। তাঁর এই বক্তব্যকে ব্রিটিশ ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অনুশীলনীয় তত্ত্ব হিসেবেই দেখতে হবে। দেশ-বিদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই সময় ব্যাপক যোগসূত্র রচনার প্রয়াসে অক্লান্ত ছিলেন। গদর দলের বিপ্লবীদের কাছে সেসময় মান্যতা পেতেন যে সব বিপ্লবী তাঁদের মধ্যে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে উচ্চারিত হতো বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নাম।

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের এই ভূমিকা তো আদবানি ও তাঁদের হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খায় না। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অংশ নেয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপ থেকে তারা তো পরিকল্পিত দূরত্ব রক্ষা করতেন। এরা খিলাফত আন্দোলনকে অনুমোদন দেয়নি, বরং বিরোধিতাই করেছিল। একথা ঠিক, খিলাফত আন্দোলনের সময় সংগঠনগতভাবে আর এস এস-এর জন্ম হয়নি, তবে আর এস এস প্রতিষ্ঠাতা কেশব হেগড়েওয়ার এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে নাগপুরে আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ-আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আর এস এস এই আন্দোলন থেকে পরিকল্পিত দূরত্ব রক্ষা করেছিল; অথচ এই বছরেই, সেপ্টেম্বর মাসে, নাগপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সরাসরি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। দেশের জাতীয় আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন আর এস এস-এর সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে না। বিপরীতে তারা উগ্র হিন্দুত্ববাদী ক্রিয়াকলাপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। হেগড়েওয়ার-এর মৃত্যুর পর আর এস এস-এর দায়িত্ব নেন মাধব রাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকর। এই গোলওয়ালকর নির্দ্বিধায় বলেছিলেন ঃ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও অভিন্ন বিপদের তত্ত্ব আমাদের জাতি সংক্রান্ত ধারণার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ানোয় প্রকৃত হিন্দু জাতিতত্ত্বের ইতিবাচক ও প্রেরণাদায়ী উপাদান থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। স্বাধীনতা সংগ্রাম কার্যত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধিতাকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এক করে দেখা হচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস, এই সংগ্রামের নেতাদের এবং সাধারণ মানুষের ওপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলেছে।

লক্ষ্যণীয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে আলাদা করতে চেয়েছিল, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে আলাদা করতে চেয়েছিল। এর একটাই অর্থ, ব্রিটিশ বিরোধিতার আন্দোলন থেকে পরিকল্পিত দূরত্বে অবস্থান নেওয়া। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের স্বাভাবিক গতিধারায় বিকশিত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে আর এস এস স্বীকৃতি দেয়নি। বরং এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তারা ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ বলতেও পিছপা হয়নি! আর এরই সম্পৃক্ততায় বিয়াল্লিশের আন্দোলন, ছেচল্লিশের নৌবিদ্রোহ সহ দেশব্যাপী সংঘটিত দুর্বার জনোত্থানজনিত আন্দোলনের উত্তাপ থেকে তারা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ত অস্ত্রে শান দিয়েছে।

স্বভাবতই এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের উচ্চতর নেতৃত্ব হিসেবে আদবানি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ বলবেন, এটাই তো প্রত্যাশিত। তিনি সাভারকর-এর ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মকাণ্ডকেও একইসঙ্গে এক পংক্তিতে ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ আখ্যা দেবেন, এটাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু তিনি সে ব্যাপারে নিশ্চুপ। কারণ কি? কারণ কি এটাই যে সাভারকর অন্যান্য বিপ্লবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন? কারণ কি এটাই যে সাভারকর মুক্তিলাভের পরবর্তীতে বিপ্লবী-আন্দোলনের পথ ত্যাগ করে হিন্দুত্ববাদের ফ্যাসিস্ত দর্শনের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন এবং হিন্দু মহাসভার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

সাভারকরের রূপান্তর

বাস্তবিক, বন্দীজীবনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর-এর চিন্তাচেতনার আমূল রূপান্তর ঘটে। ভগৎ সিং, শুকদেব, আসফাকুল্লাদের মতো বিপ্লবীদের গৌরবোজ্জল ভূমিকার বিপরীতে সাভারকর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন। আন্দামানের সেলুলার জেলে অন্তরীণ থাকাকালীন সাভারকর নভেম্বর ১৪, ১৯১৩ (কনভিক্ট নং ৩২৭৭৮) তারিখে মার্জনা ভিক্ষা করেন সরকারের কাছে। তিনি জানান ‘‘প্রডিগাল সন’ হিসেবে তিনি ‘পেরেনটাল ডোরস্ অফ দি গভর্ণমেন্ট’-এ প্রত্যাবর্তন করতে চান! ‘টাইমস অব ইণ্ডিয়া’ পত্রিকার মে ৪, ২০০২ তারিখের সংস্করণে সাভারকরের চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। তার কিয়দংশ উদ্ধার করছি। সাভারকর লিখেছিলেন ঃ ... ইফ দি গর্ভমেন্ট ইন দেয়ার ম্যানিফোল্ড বেনিফিসেন্সস্ অ্যাণ্ড মার্সি রিলিজ মি, আই ফর ওয়ান কেননট বাট বি দি স্টনচেস্ট অ্যাডভোকেট অফ কনস্টিটিউশনাল প্রোগ্রেস অ্যাণ্ড লয়ালটি টু দি ইংলিশ গর্ভমেন্ট হুইচ ইজ দি ফোরমোস্ট কনডিশনস্ অফ দ্যাট প্রোগ্রেস ...

শুধু এটুকুই নয়! সাভারকর আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছিলেন ঃ মোরওভার, মাই কনভারশন টু দি কনস্টিটিউশনাল লাইন উড ব্রিং ব্যাক অল দোজ মিসলেড ইয়ং মেন ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড অ্যাব্রড হু ওয়ার ওয়ানস্ লুকিং আপ টু মি এজ দেয়ার গাইড। আই অ্যাম রেডি টু সার্ভ দি গভর্ণমেন্ট ইন এনি ক্যাপাসিটি দে লাইক ...

লক্ষণীয়, সাভারকর ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁর বিপ্লবী রাজনীতি পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তিভিক্ষা করেছেন এবং একইসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মুক্তি পেলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থকের ভূমিকা নেবেন, এমনকি তিনি তাঁর বিপ্লবী-রাজনীতির সহযাত্রীদের তাঁর-পরিবর্তিত-মতবাদে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং সাংবিধানিক নিয়মনীতি কঠোরভাবেই মেনে চলবেন। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ‘কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর’-এর ৪০১ ধারা মোতাবেক সাভারকারের মুক্তির ব্যাপারে সরকার যেসব শর্ত আরোপ করেছিল তা সাভারকার কোনোরকম আপত্তি ছাড়াই মেনে নিয়েছিলেন এবং আগ-বাড়িয়ে দেওয়া বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে ন্যায়বিচার পেয়েছেন।

এই রূপান্তরিত সাভারকরই আদবানিদের আদর্শ।

এই রূপান্তরিত সাভারকর মুক্তিলাভের পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন এবং ফ্যাসিস্ত দর্শনের অনুপ্রেরণায় হিন্দু মহাসভার সংগঠকের ভূমিকায় এসেছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে এই রূপান্তরিত সাভারকর মুসলিম শাসকদের শাসনকে ‘হিন্দু জাতির প্রতি একটি মৃত্যু পরোয়ানা’ বলে বর্ণনা করেন। এই ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা ‘উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে ঝুঁকে’ পড়ে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, এন সি চ্যাটার্জী ও মদনমোহন মালব্যের মতো তৎকালীন নেতৃবর্গ সাভারকরের নেতৃত্বে ‘হিন্দু মহাসভা’র এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পথে অবস্থান নেওয়ার কোন বিরোধিতা করেননি। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তাঁর ‘মর্ডান ইণ্ডিয়া ১৮৮৫-১৯৪৭’ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ গোলওয়ালকরস আর এস এস কেপট স্ট্রিক্টলি অ্যালুফ ফর্ম দি আগস্ট রিবেলিয়ন, সাভারকর অন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ আর্জড হিন্দু মহাসভা মেম্বারস অফ লোকাল বডিস্, লেজিসলেটারস্ অ্যাণ্ড সার্ভিসেস টু ‘স্টিক টু দেয়ার পোস্টস অ্যাণ্ড কনটিনিউ টু প্যারফর্ম দেয়ার রেগুলার ডিউটিস্’ ...

‘হিন্দু মহাসভা’-র সভাপতি হিসেবে এই রূপান্তরিত সাভারকর যা বলেছিলেন তা তাঁর সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেছেন ঃ ‘মাদার ইণ্ডিয়া টু আস (দি হিন্দুস) ইজ ওয়ান অ্যাণ্ড ইণ্ডিভিসিবিল ইউনিটি অফ হিন্দুস্থান ফ্রম দি ভেডিক এজ ডাউন টু দি প্রেজেন্ট ডে ওয়াজ এন এস্টাবিলস্টড্ ফ্যাক্ট। দ্যাট বিইং সো, দি হিন্দুস উড নেভার টলারেট দি পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া ইনটু জোনস্, এজ ডিমাণ্ডেড বাই দি মুসলিমস্।

এখানে ‘আস’ হিন্দুদের সমার্থক শব্দ হিসেবে দ্যোতিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ঐক্য ‘ইউনিটি অফ হিন্দুস্থান’ হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এবং যেহেতু মুসলিমরা ‘ডিমাণ্ড’ করেছে সেই হেতু ‘হিন্দুরা’ (ভারতবাসী নয়) ভারত বিভক্তির বিষয়কে মেনে নেবে না। বক্তব্যের নিহিতার্থে উগ্র হিন্দুত্ববাদের ঝঙ্কার কোনরকম দ্বিধা ব্যতিরেকেই ঝঙ্কৃত হয়েছে। অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন ঃ ... ইন ইণ্ডিয়া, উই হিন্দুস্ আর মার্কড আউট এজ এন অ্যাবাইডিং নেশন বাই আওয়ারসেলভ। নট ওনলি ডু উই ওন এ কমন ফাদারল্যাণ্ড, এ টেরিটোরিয়াল ইউনিটি, বাট হোয়াট ইজ স্কেয়ারসলি ফাউণ্ড এনিহোয়ার এলস ইন দি ওয়ার্ল্ড, উই হ্যাভ এ কমন হোলি ল্যাণ্ড হুইচ ইজ আইডেন্টিফায়েড উইথ আওয়ার কমন ফাদারল্যাণ্ড ...

এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সাভারকর ভারতীয় মুসলিমদের পৃথক জাতি হিসেবে অর্থাৎ অ-ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দিনের পর দিন সাভারকর হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলমানদের তরফ থেকে সংগঠিত-বিপদের গল্প শুনিয়েছেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বলেছিলেন যে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করছে এবং ‘হিন্দুস্থানেই’ হিন্দুদের বশম্বদ দাস-এ পরিণত করতে চাইছে। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবারও বলেছিলেন যে হিন্দুরা তাদের নিজেদের দেশেই ‘রিডিউসড হেলোটস্ ...’-এ পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সাভারকর মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুত্বের লড়াইয়ের, উত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছিলেন। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র লিখেছেন ঃ দি হিন্দু মহাসভা মেড এ সার্প টার্ণ ইন দি ফ্যাসিস্ট ডাইরেকশন আণ্ডার ভি ডি সাভারকরস্ লিডারশিপ। দি আর এস এস হ্যাড বিন ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং অর্গানাইজড্ অফ ফ্যাসিস্ট লাইনস্; ইট নাউ বিগেন টু ব্রাঞ্চ আউট বিয়ণ্ড মহারাষ্ট্র। (ক্রমশ)

- অশোক চট্টোপাধ্যায়

‘‘আজকের দেশব্রতী’’ সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আরও একবার এ আই এস এ-কে বেছে নিলেন

এ বছর এ আই এস এ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যে সার্বিক রায় পেয়েছে তা ২০১০-র রায়েরই পুনরাবৃত্তি। ঐ রায় একদিকে যেমন এ আই এস এ নেতৃত্বাধীন ছাত্রসংসদের ছাত্র-স্বার্থমুখী আন্দোলন ও সাফল্যগুলোর প্রতি রায়, অন্যদিকে তা তথাকথিত মোদী হাওয়ার প্রত্যাখ্যানকে দেখিয়ে দেয় এবং আরও দেখিয়ে দেয় যে, বিভিন্ন বর্ণের 'বাম' সংগঠন (এস এফ আই/ডি এস এফ/এ আই এস এফ ইত্যাদি) তাদের টিকে থাকার জন্য কুৎসা ছড়ানো ও নাস্তিকসর্বস্বতার যে রাজনীতি করছে ছাত্রসমাজ তাকেও অনুমোদন করে না।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ পরিচালনার যে ঐতিহ্য এ আই এস এ-র রয়েছে তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে গত বছরের ছাত্রসংসদ কর্মনীতির ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জে এন ইউ-তে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধাকে বাড়ানোর লক্ষ্যে একগুচ্ছ দিশাসৃষ্টিকারী উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে ছিল—কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিকে দিনে-রাতে সর্বসময়ের জন্য খুলে রাখা; ভাষা বিভাগে বি এ ও এম এ কোর্সকে 'পারস্পরিকভাবে বিযুক্ত করা'র সিদ্ধান্তকে বাতিল করে বি এ-এম এ প্রোগ্রামের অখণ্ড অধ্যয়নকে পুনর্বহাল করা; জে এন ইউ-তে ভর্তির ক্ষেত্রে মৌখিকের গুরুত্বকে হ্রাস করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া; এক নতুন হোস্টেল নির্মাণ শুরু করা এবং আরও বেশি সংখ্যায় ডর্মিটরির ব্যবস্থা করে অধিক সংখ্যক ছাত্রদের থাকার সুবিধা করা; এম সি এম বৃত্তি লাভের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের আয়ের সর্বোচ্চ সীমাকে আগেকার ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২.৫ লক্ষ করা; সবাই ব্যবহার করতে পারবে এই মডেলের ভিত্তিতে একটি জে এন ইউ প্রেস শুরু করা; কিছু বৈষম্যমূলক নিয়মকানুনকে পাল্টানোর জন্য ইউ জি সি এবং ইউ পি এস সি-র কাছে দরবার করা এবং ক্যাম্পাসে ঠিকা কর্মীদের অধিকার ও মজুরির সুরক্ষার জন্য সজাগ হস্তক্ষেপ। এই সমস্ত উদ্যোগের পাশাপাশি জে এন ইউ-র ছাত্র সংসদ সংঘ বাহিনীর নতুন উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক অভিযান, জাতপাত ও লিঙ্গ গত হিংসা, বর্ণবাদী বৈষম্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে চালিত হিংসার বিরুদ্ধে সাহসি ও সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ আই এস এ-র পক্ষে জে এন ইউ-র ছাত্রদের রায়ের ধারাবাহিকতা এ আই এস এ-র কর্মকৃতির ধারাবাহিকতারই অনুমোদন, যে এ আই এস এ লাগাতারভাবে সমাজের সকলের স্বার্থসিদ্ধ করার নীতিমালাকে ধারণ করে জে এন ইউ-তে তাকে রূপায়িত করেছে এবং সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন, কর্পোরেট লুণ্ঠন, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জাতপাত ও লিঙ্গগত হিংসার বিরুদ্ধে জে এন ইউ-র ছাত্রসংসদকে এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর করে তুলেছে। এই রায় সেই অনুশীলনের পক্ষেই রায়।

বহুমুখী আক্রমণ ও সুবিধাবাদের মোকাবিলা করা

এখানে একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, বামপন্থী থেকে দক্ষিণপন্থী ধারার অন্য সমস্ত ছাত্র সংগঠন ও রাষ্ট্র যন্ত্রের বহুমুখী আক্রমণের মোকাবিলা করেই এ আই এস এ এই বিজয় অর্জন করেছে। একদিকে এন ইউ এস আই যেখানে তার স্বভাবসুলভ দুর্নীতিমূলক রীতিনীতি ও টাকার খেলার সংস্কৃতি নিয়ে নির্বাচনের সময়ে উদয় হয়েছে, এ বি ভি পি সেখানে 'মোদীর বিজয়ে' উজ্জীবিত হয়ে চড়া মাত্রার সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্রচার নামায়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি যে, এস এফ আই এবং ডি এস এফ-এ আই এস এফ জোটও (এল পি এফ)—যাদের কোন ইতিবাচক এজেণ্ডা ছিল না এবং যারা জে এন ইউ-র ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ২০০৭ সাল থেকে বারবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—এ আই এস এ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে, এ আই এস এ নেতৃত্বাধীন ছাত্রসংসদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো ও বদনাম দেওয়ার মধ্যেই, তার সমস্ত সংগ্রাম ও সাফল্যকে খেলো করে তোলার মধ্যেই নিজেদের যাবতীয় সক্রিয়তাকে সীমিত রাখে। বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রদের সাধারণ সভাগুলোতে—যাতে বিদায়ী ছাত্রসংসদ তার রিপোর্ট পেশ করে—এ বি ভি পি এবং এন এস ইউ আই-এর সাথে এস এফ আই, ডি এস এফ এবং এ আই এস এফ-ও একযোগে এ আই এস এ-র বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ক্যাম্পাসে ঘটনাবলীর কিছু কৌতূহল জাগানো বিকাশ দেখা গেল যখন এর আগের এস এফ আই-এ আই এস এফ বৃহৎ জোট থেকে ভেঙ্গে যাওয়া বিভিন্ন গোষ্ঠী (এস এফ আই, ডি এস এফ, এ আই এস এফ) এ বছর কিছু বিন্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করল। ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত এস এফ আই, এ আই এস এফ, ডি এস এফ মোটামুটি একক সত্ত্বাই ছিল (এস এফ আই-এ আই এস এফ নামে যারা পরিচিত ছিল) এবং বছরের পর বছর তারা একসাথে নির্বাচনে লড়েছে। কিন্তু নির্বাচনে এ আই এস এ-র হাতে লাগাতার পরাজয়ের পর ২০১২-র জুলাই মাসে এস এফ আই ভেঙ্গে ডি এস এফ গঠিত হয়। এই ভাঙ্গনের পিছনে মূলত এই ভাবনাই কাজ করে যে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে সি পি আই (এম)-এর কর্পোরেটপন্থী ও দমনমূলক নীতিকে সমর্থন করে চললে জে এন ইউ-র মত বামঝোঁকা ক্যাম্পাসে এ আই এস এ-র বিরুদ্ধে নির্বাচনে জেতা সম্ভব নয়। এ আই এস এ ছাত্রদের সমর্থনকে ধরে রাখতে পারে এই কারণে যে, ঐ সমর্থনের জন্য সে অন্ধ সি পি আই (এম) বিরোধিতার উপর নির্ভর করেনি, বরং তার ইতিবাচক ও নীতিনিষ্ঠ এজেণ্ডা ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। যে কোনোভাবে এ আই এস এ-কে হারানোর জন্য এ বছর ডি এস এফ, এস এফ আই এবং এ আই এস এফ আবার হাত মেলানোর কথা বিবেচনা করে, কিন্তু তা কোন আনুষ্ঠানিক চেহারা পায় নি।

এরপর ডি এস এফ-এ আই এস এফ আবার এই স্ব-বিরোধী শ্লোগান হাজির করে 'দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন, এ আই এস এ-কে পরাজিত করুন'। এইভাবে 'বাম ঐক্য' সম্পর্কে সমস্ত লম্বা-চওড়া কথা পর্যবসিত হল আর একটা বামপন্থী সংগঠন এ আই এস এ-র বিরুদ্ধে 'ঐক্যে'। দ্য হিন্দু পত্রিকা তার ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপে যে, জে এন ইউ-র মর্যাদাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কিত বিতর্কে 'এ আই এস এ-কে আক্রমণই সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছে!' এ আই এস এ-র উপর এই ধরণের নিকৃষ্ট আক্রমণকে ছাত্ররা ভালো চোখে দেখেনি, তারা বরং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে একটা নীতিনিষ্ঠ ও শক্তিশালী আক্রমণাত্মক প্রচারই দেখতে চেয়েছিল।

এছাড়াও, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয় প্যানেলের তিন প্রার্থী সহ (আশুতোষ, অনন্ত ও চিন্টু) গুরুত্বপূর্ণ এ আই এস এ কর্মীদের উপর চাপানো মামালার মোকাবিলা তাদের করতে হয়; এন এস ইউ আই, এ বি ভি পি এবং দিল্লী পুলিশ প্রচার মাধ্যমে যে মিথ্যা ও দূরভিসন্ধিমূলক কাহিনী ছড়ায় এ আই এস এ-কে তারও মোকাবিলা করতে হয়। নির্বাচনের ঠিক দুদিন আগে দিল্লী পুলিশ ২০১২-র ডিসেম্বরে শিলা দীক্ষিত সরকারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ-বিরোধী প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে এ আই ডব্লিউ পি এ সম্পাদিকা কবিতা কৃষ্ণাণ এবং নেতৃত্বকারী এ আই এস এ কর্মী আনমল ও ওমের বিরুদ্ধে চার্জশীট পেশ করে। এই বহুমুখী আক্রমণ ও কুৎসা অভিযানের মোকাবিলা করে এবং 'মোদী হাওয়া'র সুকৌশলী জোরদার প্রচারের উপর ভর করে এ বি ভি পি-র চাঙ্গা হয়ে ওঠার পৃষ্ঠভূমিতেই এ আই এস এ ছাত্রসংসদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং বিজয়ী হয়।

এ বি ভি পি-র প্রতারণামূলক প্রচার

এ বি ভি পি সত্য ঘটনাকে বিকৃত করে দাবি করে যে, ১১টি কাউন্সিলার পদে তাদের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছে এবং জে এন ইউ-তে তারা তাদের ভোট বাড়াতে পেরেছে। প্রকৃত ঘটনাকে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। নির্বাচনের সময় এ বি ভি পি ১১ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে যারা এ বি ভি পি-র হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এদের মধ্যে মাত্র একজন—সংস্কৃত বিভাগ থেকে—জয়ী হয়। নির্বাচনের পর বাকি যে বিজয়ী প্রার্থীদের এ বি ভি পি তার নিজের বলে দাবি করছে তারা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা নির্দলীয় প্রার্থী।

এ বারের নির্বাচনে এ বি ভি পি-র ফলাফলকে যথার্থভাবে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, ২০০৭ থেকে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে মোট ভোট (ইয়ুথ ফর ইকোয়ালিটি, এ বি ভি পি, এন এস ইউ আই) মোটামুটি একই রয়েছে। একথাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এখনকার তুলনায় ২০০৭-এ ভোটার সংখ্যা অনেক কম ছিল। ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণ রূপায়িত করা এবং তার সাথে সাধারণ, অসংরক্ষিত আসন সংখ্যাও বাড়ার ফলে জে এন ইউ-তে দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলোর ২০১৪-তে প্রাপ্ত ভোট ২০০৭-এর স্তরেই রয়ে গেছে।

উদারহরণস্বরূপ, ২০০৭-এ প্রেসিডেন্ট পদে ইয়ুথ ফর ইকোয়ালিটি (এই সংগঠনই ২০০৭ সালে দক্ষিণপন্থী অক্ষ ছিল) ৯২৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছিল, আর এবার এ বি ভি পি (যে এবার হয়ে উঠেছে দক্ষিণপন্থী অক্ষ) ৯৪৪ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছে। জে এন ইউ-তে ২০০৭-এর পর থেকে বামেদের পরিসর ও সমর্থন বেড়ে চলার ধারাই দেখা যাচ্ছে। এবার প্রেসিডেন্ট পদে এ বি ভি পি তুলনামূলকভাবে যে বেশি ভোট পেয়েছে তা এসেছে এন এস ইউ আই-এর জঘন্য ও অস্বাভাবিক রকমের খারাপ ফলের পটভূমিতে, তারা পেয়েছে মাত্র ১২৯ ভোট।

এবছর এ বি ভি পি দক্ষিণপন্থী অক্ষ হিসাবে অবশ্যই উঠে এসেছে, এবং এ বি ভি পি-র দিক থেকে বিপদের যে সম্ভাবনা রয়েছে তার বিরুদ্ধে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে, কেননা তার পিছনে মোদী সরকারের মদত রয়েছে। ২০০৭-এর মত ২০১৪-তেও জে এন ইউ-র ছাত্রছাত্রীরা সেই বামপন্থী শক্তি হিসাবেই এ আই এস এ-কে সুস্পষ্টভাবে বেছে নিয়েছে, সংহত দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রত্যয়ী চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য যার উপর তারা নির্ভর করতে পারে। নির্বাচনের সময় কিছু বাম গোষ্ঠীর জোট বাঁধাবাঁধি এবং এ আই এস এ-র উপর ভিত্তিহীন আক্রমণের পিছনে যে সুবিধাবাদী তাড়না কাজ করছে, তাকে চিহ্নিত করে যথযোগ্য জবাব দেওয়ার জন্যও তাঁরা এ আই এস এ-কে বেছে নিয়েছেন।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের নির্বাচনে এ আই এস এ-র সাফল্য সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ, কর্পোরেট লুণ্ঠন, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, আফস্পার বিরুদ্ধে দেশে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে প্রেরণাদায়ী হয়েই দেখা দিয়েছে—এই বিজয় অবশ্যই সেই সমস্ত মানুষেরও বিজয় যাঁরা শ্রমিকদের অধিকার, লিঙ্গ ন্যায়ের জন্য এবং এদেশের জনগণের উপর নয়া-উদারবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

(লিবারেশন, অক্টোবর ২০১৪)

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদে নির্বাচিত চার কার্যনির্বাহী প্রার্থীর পরিচিতি

সভাপতি ঃ আশুতোষ কুমার—আশুতোষ বর্তমানে জে এন ইউ-তে পি এইচ ডি করছে। ২০০৯ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বিষয়ে এম এ পড়ার জন্য সে জে এন ইউ-তে ভর্তি হয়। তার বাড়ি বিহারের বার-এ এবং তার বাবা রেলের স্টেশন মাস্টার। এ আই এস এ-র অন্যান্য অনেক নেতৃবৃন্দের মত আশুতোষের কাছেও এ আই এস এ-তে যোগ দেওয়ার তাৎপর্য হল খুব কাছ থেকে দেখা জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়াই করার এক পথ।

সহ সভাপতি ঃ অনন্ত প্রকাশ নারায়ণ—অনন্ত-এর বাড়ি উত্তরপ্রদেশের চন্দৌলিতে। অনন্ত প্রশিক্ষিত আইনজীবী এবং জে এন ইউ-তে এম ফিল করতে আসার আগে সে বেনারসে আইন নিয়ে অধ্যয়ন করেছে। সে অবশ্য সদ্য সদ্য এম ফিল করেছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এ আই এস এ-তে যোগ দেয় এবং বেনারসের কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ আই এস এ-র সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠে।

সাধারণ সম্পাদক ঃ চিন্টু—চিন্টুর বাড়ি সি পি আই (এম এল) নেতৃত্বে পরিচালিত সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিভূমি ভোজপুরের আরায়। ওর বাবা পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী এবং মা জীবিকার জন্য বাড়ি-বাড়ি চুড়ি বিক্রি করেন। ওর ভাই সন্দীপ আরায় পড়াশোনা করে এবং এ আই এস এ-র কর্মী। ওর শৈশব কাটে কস্তুরবা বালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলে এবং দিল্লীতে সি পি আই (এম এল)-এর কেন্দ্রীয় অফিসে। এই পার্টি অফিসই ছিল ওর দ্বিতীয় বাড়ি। দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর ও তার পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে এম এ করার জন্য জে এন ইউ-তে ভর্তি হয়। চিন্টু এখন রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম ফিল করছে। ভোজপুরের বিপ্লবী গানগুলোর মর্মস্পর্শী পরিবেশনার জন্যও জে এন ইউ-র ছাত্রছাত্রীরা ওকে চেনে।

যুগ্ম সম্পাদক ঃ সফকত হুসেন বাট—সফকতের বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের কিশওয়ারে। সফকত কেন এ আই এস এ-তে যোগ দিয়েছে সে সম্পর্কে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকা সফকতকে উদ্ধৃত করে ছেপেছে ঃ "যে গণতান্ত্রিক পরিসর জে এন ইউ-তে পাই ওখানে তা নেই। ... এ আই এস এ নিপীড়িতদের জন্য লড়াই করে বলেই আমি এই সংগঠনে যোগ দিয়েছি। আর আমরাও নিপীড়িত।" সফকত পার্সি ভাষায় গবেষণা করছে।

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com